মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

নাসির হেলাল

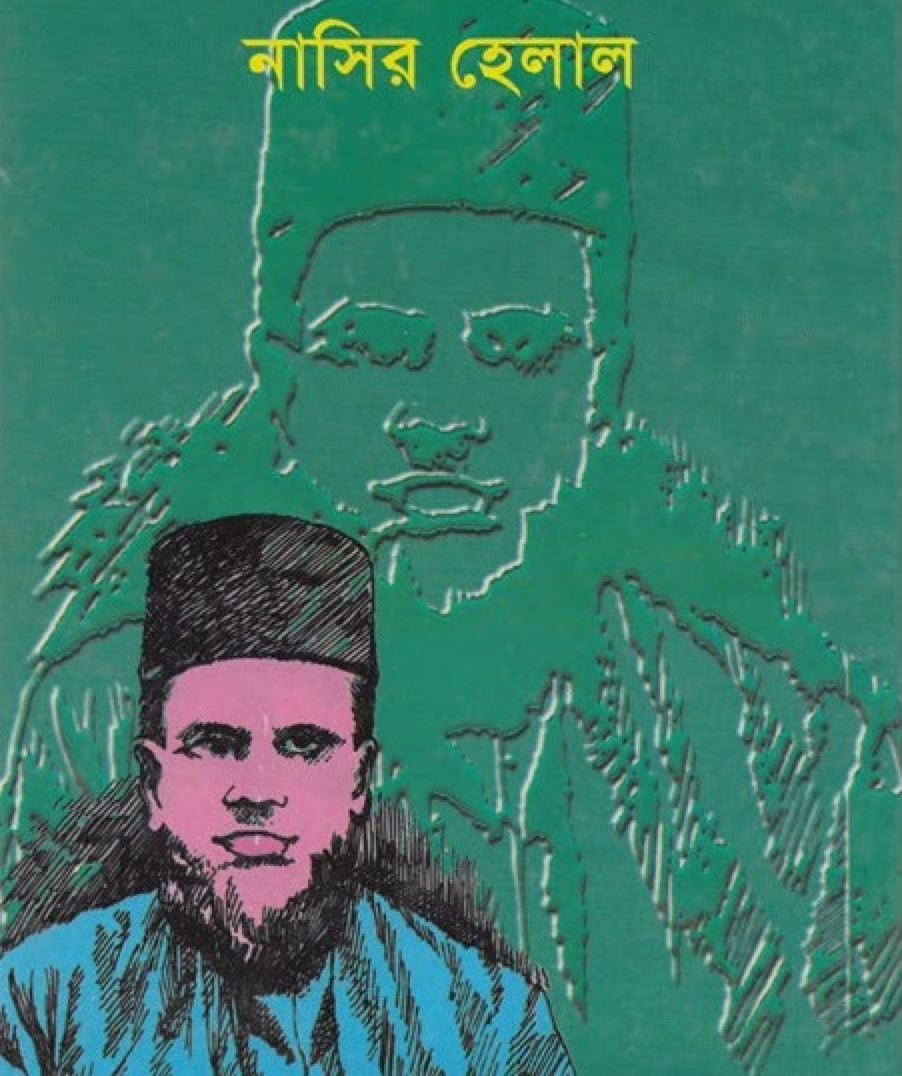

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

নাসির হেলাল

সুহৃদ প্রকাশন

www.pathagar.com

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

নাসির হেলাল

প্রকাশক

তাসফীন ফাহাদ

সুহৃদ প্রকাশন

১/জি-৯ মীরবাগ, ঢাকা - ১২১৭

পরিবেশক

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০
E-Mail: asfaqur@bdonlin.com

প্রচ্ছদ

গোলাম মোহাম্মদ

কম্পিউটার কম্পোজ

প্রীতি কম্পিউটার সেন্টার

দ্বিতীয় সংস্করণ

ফেব্রুয়ারী – ১৯৯৯

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

দাম ঃ ৩৫.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

জান্নাতবাসী দাদা
আলহাজ্ব মুন্সী সামনুর সাহেবের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সূচীপত্র

গোড়ার কথা	৫
মেহেরউল্লার উপাধি	৬
মেহেরউল্লার জন্ম	৮
বংশ তালিকা	৯
বাল্য ও শিক্ষা	১০
যৌবনে মেহেরউল্লা	১১
খ্রীস্ট ধর্মের খপ্পরে মেহেরউল্লা	১২
দার্জিলিং-এ মেহেরউল্লা	১৩
সংগ্রামী মেহেরউল্লা	১৪
মুন্‌শী জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান হলেন	১৫
জন্‌ জমিরুদ্দীনের ইসলাম গ্রহণ	১৬
মেহেরউল্লার অগ্রযাত্রা	১৯
সমাজ সংস্কারক মেহেরউল্লা	২১
শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব	২২
মেহেরউল্লার ব্যক্তিজীবন	২৫
মেহেরউল্লার উপস্থিত বুদ্ধি	২৭
গাল্পিক মেহেরউল্লা	৩০
সাহিত্যিক মেহেরউল্লা	৩৪
সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা	৪১
সংগঠক মেহেরউল্লা	৪২
পরপারের পথে মেহেরউল্লা	৪৪
মেহেরউল্লার কাজের স্বীকৃতি	৪৬

www.pathagar.com

গোড়ার কথা

তোমাদের নিকট যদি প্রশ্ন করি আমরা কোন দেশের নাগরিক? তোমরা দেরি না করে ঝট্ করে বলে ফেলবে, কেন বাংলাদেশের নাগরিক? অর্থাৎ আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। কিন্তু এদেশের পূর্ব ইতিহাস হয়তো অনেকেরই জানা নেই। তোমরা জান ১৭৫৭ সালে পলাশীর আমবাগানে ইংরেজ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা সূর্য ডুবে গিয়েছিল। ইংরেজরা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে কেড়ে নেয় তাঁর রাজ্য। তারপর থেকে তারা ভারত উপমহাদেশে প্রায় দু'শ বছর চালায় তাদের অত্যাচারের স্টীম রোলার। আর এ অত্যাচার মূলতঃ ছিল মুসলমানদের ওপর। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় ইংরেজ এদেশ শাসন করার আগে মুসলমানরা প্রায় সাত'শ বছর ধরে এই বিশাল উপমহাদেশে রাজত্ব করেন। আর ইংরেজরা, ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলও মুসলমানদের নিকট থেকে, তাই তারা মুসলমানদেরকেই আসল শত্রু মনে করতো। হিন্দুরা এর ভেতর-বাইরে ছিলনা। তাদের ব্যাপার হলো শুধুমাত্র শাসক পরিবর্তন। মুসলমানরা এতদিন শাসন করেছে এখন ইংরেজরা, এতে আর অসুবিধা কি? বরঞ্চ হিন্দুরা সুযোগ পেল, তারা মুসলমানদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি ইংরেজ প্রভুদের সামনে তুলে ধরে নিজেদেরকে তাদের হিতৈষী বন্ধুরূপে প্রমাণ করতে সবরকম চেষ্টা চালাল। সত্যিকার অর্থে লাভবান হলো তারাই। শিক্ষা দীক্ষায় মুসলমানরা একশো বছর পিছিয়ে গেল।

এই সময়ই ইংরেজ শাসিত ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ছত্র ছায়ায় একশ্রেণীর গোড়া হিন্দু ও খ্রীস্টীয় প্রচারক এদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা অভিযানে অবতীর্ণ হয়। ঠিক এই সময়ই মুসলমানদের তথা ইসলামের রক্ষক হিসেবে যশোর শহর থেকে মাত্র চার মাইল দূরে

www.pathagar.com

ছাতিয়ানতলা গ্রামে একজন বিপ্লবী সৈনিকের আবির্ভাব হয়।

তোমরা মনে করছ, না জানি এই বিপ্লবী সৈনিক সামরিক দিক থেকে কত পারদর্শী ছিল? তাঁর অস্ত্রখানায় কত অস্ত্র ছিল! কামান, বন্দুক, মেশিনগান, শেল, মটার ইত্যাদি ইত্যাদি অথবা কতনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিক ছিল তাঁর অধীনে! আসলে কিন্তু তেমন কোন কিছুই ছিলনা তাঁর। হ্যাঁ। তবে একটা জিনিস তাঁর ছিল। যার কাছে দুনিয়ার সবকিছুই হার মেনেছে। সেটা হল তাঁর ঈমানের অমীয় তেজ। যার বলেই তিনি প্রতিহত করেছিলেন তৎকালীন খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কার কথা বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ! তিনিই অস্ত্রহীন বিপ্লবী সৈনিক মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

মেহেরউল্লার উপাধি

মুন্‌সী মেহেরউল্লার প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে অনেকগুলি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন, বাগ্মীকুলতীলক, সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, জাতির ত্রাণকর্তা, বঙ্গবন্ধু, মুসলিম বাংলার রামমোহন, বাংলার মার্টিন লুথার, কর্মবীর, যশোরের চেরাগ, দীনের মশাল, ধর্ম-বক্তা প্রভৃতি।

তাকে বাগ্মীকুলতীলক উপাধিতে এ জন্য ভূষিত করা হয় যে, তৎকালীন সময়ে বাংলায় তাঁর সমকক্ষ কোন বক্তা ছিলেন না।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং বিজয়ীও হয়েছিলেন। এ জন্য তাকে 'সমাজ সংস্কারকের' সম্মান দেয়া হয়।

তিনি লেখালেখি, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে মূলত ইসলামের দাওয়াতী কাজটাই করতেন তাই তাঁর উপাধি দেয়া হয় 'ইসলাম প্রচারক' হিসাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই

www.pathagar.com

নাজুক। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে পড়ছিল, উপরন্তু খ্রীস্টান মিশনারীরা এ সুযোগে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে ধর্মান্তরিত করছিল। মুন্সী মেহেরউল্লা বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়কে এ লজ্জাকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। এ জন্য তাঁকে 'জাতির ত্রাণকর্তা' বলে।

তিনি বাংলার মানুষের সার্বিক কল্যাণ কামনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যত কিছু করেছেন অপরের জন্যই করেছেন। সত্যিকার অর্থে নিজের জন্য কিছুই করেননি। তাই তৎকালীন সময়ের পন্ডিত সমাজ ও সাধারণ মানুষ মুন্সী সাহেবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা রামমোহন যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতরকার কুসংস্কারগুলো ঝেটিয়ে বিদায় করার চেষ্টা করেছিলেন মুন্সী মেহেরউল্লাও তেমনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ থেকে কুসংস্কার উচ্ছেদ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তাই তাঁকে বলা হতো 'মুসলিম বাংলার রামমোহন'।

কাজ ছাড়া মুন্সী মেহেরউল্লা কিছুই বুঝতেন না। তিনি দিন-রাত ছুটে বেড়াতেন অধঃপতিত মুসলিম জাতির প্রকৃত কল্যাণ কামনায়। এমনকি তাঁর অকাল মৃত্যুও হয়েছিল অতিরিক্ত কাজের কারণে। আর এ জন্য তাঁকে বলা হতো 'কর্মবীর।'

তাঁর সম্পর্কে মৌলানা আকরাম খাঁ বলেছেন, "কর্মজীবনের প্রারম্ভে স্ব-সমাজের দৈন্য দুর্দশার যে তীব্র অনুভূতি আমার মন ও মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, আপনাদের এই যশোহরেরই একজন ক্ষণজন্মা মুসলমান কর্মবীরের (মুন্সী মেহেরুল্লাহর) সাধনার আদর্শ তাহার মূলে অনেকটা প্রেরণা যোগাইয়া দিয়াছিল।'

আপন ধর্মের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর কথা ও কাজে ছিল এক। তাই তাকে 'দীনের মশাল' বলা হতো।

তিনি ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলো খুব সহজ করে মানুষকে বোঝাতেন বলে তাকে 'ধর্ম-বক্তা' বলা হত।

মুন্সী মেহেরউল্লা যশোরের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ জন্য তাকে 'যশোহরের চেরাগ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

www.pathagar.com

তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের কারণে তৎকালীন সময়ের খৃস্টানগণ তাঁকে মুসলমান সমাজের 'মার্টিন লুথার' নামে অবিহিত করে।

মেহেরউল্লার জন্ম

তোমরা অনেকেই বারোবাজারের নাম শুনে থাকবে। আর এই বারোবাজারেরও তো একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। এখানে, যশোরাদ্য দেশের শাসনকর্তা হযরত খাজা খাঁন জাহান আলী আস্তানা গাড়েন। তা'ছাড়া গাজী কালু চম্পাবতীর স্মৃতি বিজড়িত এই বারোবাজার। এখানে তাঁদের স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ অনেক কিছুই বর্তমান আছে। তার মধ্যে গোড়া মসজিদ ও একশত ছাব্বিশটি দীঘিই প্রধান।

যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন প্রসিদ্ধ বারোবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে এক কন্‌কনে শীতের রাত্রিতে মেহেরউল্লা তাঁর মামা বাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তারিখটা ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ। ইংরেজী ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার দিবাগত রাতে।

পৈত্রিক সূত্রে তিনি এক ধর্মপরায়ণ ঐতিহ্যবাহী মুসলিম্ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্‌শী মোহম্মদ ওয়ারেছউদ্দীন একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। তিনি যশোর শহর থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত ছাতিয়ানতলা গ্রামে বাস করতেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন বলে জানা যায়।

মরহুম মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা জন্মের ছয়মাস পর মামা বাড়ি থেকে পিতৃগৃহে আসেন।

তিনি যে ভবিষ্যতে একজন সংগ্রামী সংস্কারক হবেন একথা তাঁর জন্মের সময়টায় যেন ঘোষণা করে দিয়েছিল। তীব্র শীতের ভিতর জন্মই তার বাস্তব প্রমাণ।

www.pathagar.com

বংশ তালিকা[১]

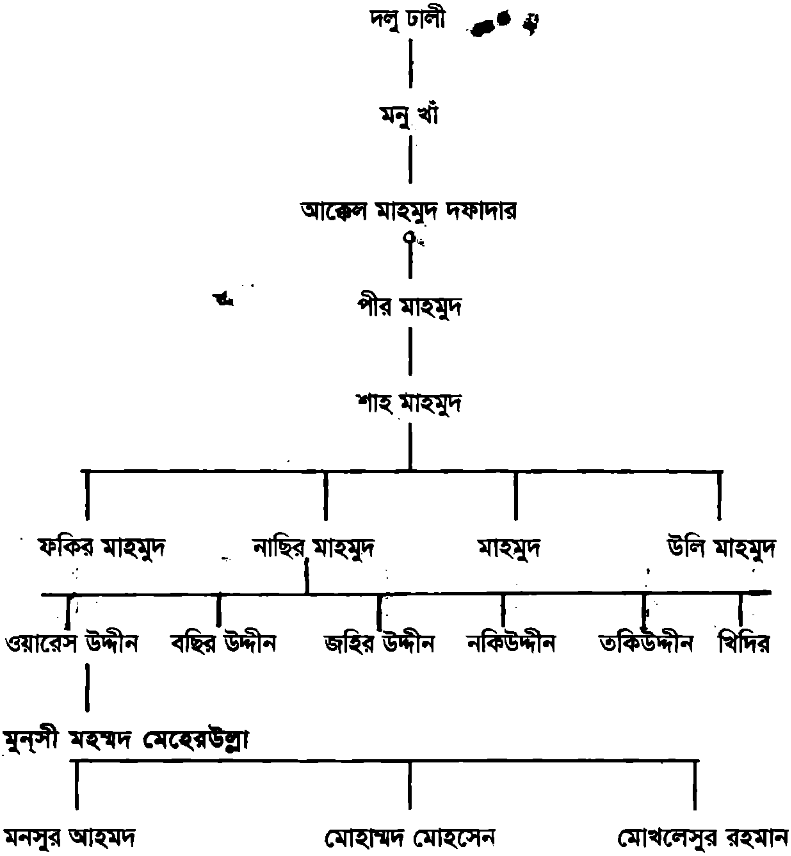

১. এই বংশ তালিকা মুন্সী সাহেবের প্রথম পুত্র মনসুর আহমদ-এর স্বহস্তে লেখা তালিকা থেকে তুলে দেয়া হলো।

www.pathagar.com

বাল্য ও শিক্ষা

জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছর পিতা-মাতার অত্যন্ত আদর যত্নেই কাটল তাঁর। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার দুই কন্যা সন্তানের পর একমাত্র পুত্র সন্তান। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল করে রাখলেই তো আর চলবে না! তাঁর লেখাপড়া শেখানো চাই, মানুষের মত মানুষ করা চাই। তাই পিতা আদরের পুত্রকে পাঁচ বছর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। কৃতিত্বের সাথে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ শেষ করে যখন তিনি 'বোধোদয়' পড়া আরম্ভ করলেন তখন তাঁর প্রধান সাহায্যকারী পিতা মুন্‌শী মোহাম্মদ ওয়ারেছউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার অগ্রগতিতে বাঁধা আসে। এতে হয়তো বা আল্লাহর কোন মহান উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, এই ছেলেকেই ভবিষ্যতে অসাধ্য সাধন করতে হবে, বহু সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। তাই একটু বাস্তব ট্রেনিং শিশুকাল থেকেই দিয়ে নিতে চান মহান রাব্বুল আলামীন। যেমন অন্যান্য মনীষীদের জীবনেও আমরা ঘটতে দেখি।

কিন্তু মুন্‌সী সাহেবের মা ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যানুরাগিনী। যার কারণে শত কষ্টের মধ্যেও তিনি পুত্রকে লেখপাড়া শেখানোর চেষ্টা করতেন। লেখা পড়ার ব্যাপারে তাঁর মা এমনি অনুপ্রেরণা দিতেন যে, পরবর্তীকালে মেহেরউল্লা তাঁর মায়ের প্রেরণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি আমার মাতার যত্ন ও চেষ্টাতে যাহা কিছু শিখিয়াছি।" তাঁর জ্ঞান তৃষ্ণা এতো প্রবল ছিল যে চৌদ্দ বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করে তিনি কয়ালখালী গ্রামের মৌলভী মেসবাহউদ্দীন সাহেবের নিকট তিন বছর এবং করচিয়া গ্রামের জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের নিকট তিন বছরকাল আরবী ও ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। কোরআন শরীফ, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় তিনি যে বুৎপত্তি লাভ করেন, পরবর্তী জীবনে তাঁর গ্রন্থাবলী ও ঘটনা সমূহে তার নজীর পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়। ঐ বয়সেই তিনি শেখ সাদীর গুলিস্তা, বুস্তা ও পান্দনামা মুখস্ত করেন। এমন কি মহীশুর থেকে প্রকাশিত "মুনসুরে মুহাম্মাদী" নামক পত্রিকার গ্রাহক ও একনিষ্ঠ পাঠক হন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে জানা যায় তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য কত তৃষ্ণার্ত ছিলেন। মেহেরউল্লার ছাত্র জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কর্ম জীবনেও আমরা তাঁকে জ্ঞান আহরণরত দেখতে পাই।

যৌবনে মেহেরউল্লা

পিতৃহীন এই বালক যে অত্যন্ত গরীব ছিলেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যৌবনে পদার্পণের পর চাকরীর সন্ধানে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের কেরানীর পদের জন্য আবেদন করেন। সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি যে অবস্থার সম্মুখীন হন তা ছোট বড় সবার জান্য একটি নজীর হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে। সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েছিলেন মেহেরউল্লা। ছেলেমানুষ হলেও প্রত্যয় দীপ্ত চেহারা। তৎকালীন জেলা বোর্ডের কর্তা ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দেখেই বললেন, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবেনা। মুন্সী সাহেব কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন ছুড়লেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেক লক্ষ্য করে 'বেয়াদবী মাফ করবেন, আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না কেন স্যার?' সাহেব বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই অতএব তুমি পারবেনা; আমরা একজন অভিজ্ঞ মানুষ চাই।' এরপর মুন্সী সাহেব কি জবাব দিয়েছিলেন জান? সাহেব পর্যন্ত চমকে গেলেন। "তিনি বললেন, স্যার! চাকরীতে ঢোকার আগে আপনার কি কোন অভিজ্ঞতা ছিল? তবুও আপনি যখন পেরেছেন আমি কেন পারব না?"

সাহেব ডাগর চোখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিন্তু বিরক্ত হলেন না। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তুমিই পারবে।' অতএব চাকরী হয়ে গেল। কিন্তু যারা সারা জীবন স্বাধীনতার পূঁজারী, যারা স্বাধীন জীবন ভালবাসেন তারা কি

www.pathagar.com

বাধাধরা নিয়মের ভিতর জীবন যাপন করতে পারেন? তাইতো একদিন মেহেরউল্লাকে দেখা গেল খোজারহাট এক দর্জির দোকানে। চাকরী ছেড়ে ধরলেন দর্জির কাজ। অবসর পেলে তিনি মোটেই সময় নষ্ট করতেন না. মুন্শী তাজ মাহমুদ নামে জনৈক ব্যক্তির নিকট উর্দু ও ফারসী সাহিত্য পাঠ করতেন। এরপর তিনি ঘড়চী গ্রামের জাঁহাবখশ মৃধা নামে একজন নামকরা সাহেব বাড়ির দর্জির নিকট উন্নতমানের দর্জির কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকারণেও বুৎপত্তি লাভ করেন। ৫/৬ বছর তিনি সাহেব বাড়িতেই কৃতিত্বের সাথে কাজ করেন।

সাহেব বাড়ির কাজ শেষে তিনি যশোর দড়াটানায় অত্যাধুনিক একটা দর্জির দোকান খোলেন। তাঁর ব্যবহার এত মধুর ছিল যে, যশোরের শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁর খরিদ্দারে পরিণত হন। তা'ছাড়া তাঁর তৈরী পোশাক ছিল রুচি সম্মত। এমন কি তৎকালীন ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে পোষাক তৈরী করতেন। তাঁর বিজ্ঞানোচিত কথা বার্তায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তাঁর দোকানে আসতেন, আলোচনার জন্য। বলা যায় পরবর্তীতে দোকানটা মোটামুটি একটা জ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই দোকান থেকেই তিনি শুরু করেন পাদ্রীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

খ্রীস্ট ধর্মের খপ্পরে মেহেরউল্লা

খ্রীস্টান পাদ্রীরা যখন উঠে পড়ে তাদের ধর্ম প্রচার করতে লাগল, বিশেষ করে যশোরের আশে পাশে তারা ব্যাপকভাবে কাজ চালাতে শুরু করল তখন তাদের কাজ কারবারে মুন্সী মোহম্মদ মেহেরউল্লা কিছুটা মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এমনকি তাদের প্রচার প্রচারণায় অনেক লোকই ঐ সময় খ্রীস্টান ধর্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মুন্সী সাহেবের মনে প্রশ্ন দেখা দিলো। এ প্রসংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বিশিষ্ট বন্ধু মুন্শী শেখ

www.pathagar.com

জমিরুদ্দীন বলেছেন "পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনিয়া বাইবেল ও খ্রীস্টান ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খ্রীস্টান ধর্মে তাঁহার আস্থা জন্মে।"

বুঝতেই পারছো তাঁর জীবনে এ সময়টা কেমন সংকটময় ছিল। এই সময় খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ যাকে কল্যাণ দান করবেন, যাকে দিয়ে মুসলিম কওমের খেদমত করাবেন তিনি কি এতটুকুতে ভেঙ্গে পড়তে পারেন? দেখা গেল প্রথম ধকলটা তিনি সামলে নিয়েছেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ বক্তা ও ইসলাম প্রচারক হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর 'খ্রীস্টান ধর্মের ভ্রস্টতা, নামে বইটি তাঁর হাতে এসে পৌছল। তাছাড়া প্রথম জীবনে খৃস্ট ধর্ম প্রচারক ও পরবর্তী জীবনে ইসলাম ধর্ম প্রচারক ইশান চন্দ্র মণ্ডল ওরফে মুনশী মুহম্মদ এহছানউল্লাহ সাহেব কৃত "ইঞ্জিলে হযরত মুহম্মদের খবর আছে" নামক পুস্তক খানিও তিনি পেয়ে যান।

ব্যাস! এই দু'খানি বই তাঁর জীবনে পরশ পাথর বুলিয়ে দিলো। তিনি ইসলামের একজন অনন্য খাদেমে পরিণত হলেন।

দার্জিলিং -এ মেহেরউল্লা

সাহেব বাড়িতে কাজ করার সময় মেহেরউল্লা মাঝে মাঝে দার্জিলিং যেতেন। এবার কিন্তু দার্জিলিং-এ গিয়ে তিনি দোকান খুলে বসলেন। এ ব্যাপারে যশোরের ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যখন দার্জিলিং বদলী হন তখন মুন্সী মেহেরউল্লাকে সাথে করে নিয়ে যান। দার্জিলিং এসে অনেক ভদ্র লোকের সাথে তাঁর ওঠা-বসা হয় এবং এই সময়ই তিনি একজন ভদ্র লোকের পরামর্শে মনসুরে মুহাম্মাদীর গ্রাহক হন। এখানে তিনি খ্রীস্টান পাদ্রীদের কাজ কারবার দেখে ব্যথিত হন। তাই তিনি আবার নতুন করে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এবার

www.pathagar.com

কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। তিনি বুঝলেন তুলনামূলকভাবে যদি সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে তা'হলে জনসাধারণকে বুঝান মুশকিল। তাই তিনি খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা কয়েকটি উর্দু গ্রন্থসহ বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি ধর্মের গ্রন্থগুলি একান্ত মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন। "তোহফাতুল মুকতাদী" নামে উর্দু গ্রন্থ থেকে তিনি বিভিন্ন ধর্মের ত্রুটিগুলি পুংখানুপুংখরূপে জেনে নিলেন। এছাড়া সোলায়মান ওয়ার্সী লিখিত" "কেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম" এবং 'প্রকৃত সত্য কোথায়', এই তিন খানা বই তিনি পাঠ করেছিলেন। এরপর তিনি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে যশোরে ফিরে এলেন।

সংগ্রামী মেহেরউল্লা

দার্জিলিং থেকে ফিরে তিনি দেশের যে করুণ অবস্থা দেখলেন তাতে তাঁর মন হু-হু করে কেঁদে উঠল। কোথায় গেল দোকান, কোথায় কি–তিনি নেমে পড়লেন পাদ্রীদের অনুকরণে হাটে-মাঠে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে। চলতে লাগলো বাদ প্রতিবাদ। একদিকে খ্রীস্টান পাদ্রীদের বক্তৃতা অন্যদিকে মেহেরউল্লার বক্তৃতা। এ ব্যাপারে সব সময় মুন্সী সাহেবের সাথে যারা ছায়ার মত ঘুরতেন তাঁরা হলেন ঘুরুলিয়া গ্রামের মুনশী মুহম্মদ কাশেম এবং যশোর শহরের ঘোপ গ্রামের মুনশী গোলাম রব্বানী, জানা যায় অনেক সময় তাঁরাও বাক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন।

এসময় মুসলমানদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, ইংরেজ বেনিয়া শাসক গোষ্ঠীর সাথে অসহযোগিতা করতে গিয়ে তাঁরা দারুণভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। একথা অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ওহাবী আন্দোলন হয় ব্যর্থ। আলেম সমাজের মধ্যে দেখা দেয় অনৈক্য। দারুল হরব, দারুল আমান, দারুল ইসলাম নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে তখন হানাফী ও মুহাম্মাদীর মধ্যে

www.pathagar.com

তীব্র আকারে। এমনিতর অবস্থার মধ্যদিয়ে পাদ্রীদের অপপ্রচারে ও প্রলোভনে দলে দলে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। বাদশার জাত মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে যখন হিন্দু ও খ্রীস্টানদের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তখন তাদের সম্বল ছিল একটু ক্ষীণ ঈমান। কিন্তু তাও যখন চলে যেতে থাকলো তখন মুন্‌সী মেহেরউল্লা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তুলে ধরলেন দুর্দশাগ্রস্থ মুসলিম জাতির সামনে জ্ঞানের প্রজ্বলিত মশাল।

তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন সর্ব প্রকারের অত্যাচার, অনাচার, কদাচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। প্রয়োজন তাঁকে কলকাতায় টেনে নিয়ে গেল। তিনি "সুধাকর" পত্রিকার সম্পাদক শেখ আবদুর রহীম ও 'মিহির' পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌শী রিয়াজ উদ্দীন মাশহাদী প্রমুখ আলেম ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের সাথে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজ নিয়ে আলাপ করলেন। ফলশ্রুতিতে খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার, খান বাহাদুর নুর মুহম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রীটের, "নাখোদা" মসজিদে সমবেত হলেন। তাঁরা, "নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করলেন। সমিতির সদস্যবৃন্দ মুন্‌সী মেহেরউল্লার উপর বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এক বর্ণনায় জানা যায় এই কঠিন দায়িত্ব পালনে তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) সাহেবের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন।

দায়িত্ব পাওয়ার পর দায়িত্বশীল মুন্‌সী মেহেরউল্লা আর এক মুহূর্তও বসে থাকেন নি। তিনি ইসলাম প্রচারের মহান লক্ষ্যকে সামেন রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাংলা আসামের হাটে-মাটে, শহর-গঞ্জের জনসভায়, ব্যর্থ করতে চেষ্টা করলেন বেনিয়া শ্বেত-ভল্লুক ইংরেজদের অপ্রচারকে।

খ্রীস্টানদের সাথে তর্ক করতে করতে মেহেরউল্লা তর্কবাগীশ হয়ে উঠলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর তর্কশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলো, ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্ম শাস্ত্রে তিনি জ্ঞানী হয়ে উঠলেন। এ প্রসংগে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর "কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ" গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায়

www.pathagar.com

লিখেছেন "ইসলামের দীপ্ত প্রভাবে সে দর্জি মেহেরুল্লাহ বঙ্গ বিখ্যাত বাগ্মী কুলতিলক, অদ্বিতীয় সমাজ সংস্কারক মুন্‌শী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহই পরিণত হইলেন।"

মুন্‌শী জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান হলেন

মুনশী মুহম্মদ জমির উদ্দীন সাহেব খ্রীস্টানদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হন এবং খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহন করে জন জমিরুদ্দীন পরিণত হন। জন্ জমিরুদ্দীনের জন্মস্থান ছিল তখনকার নদীয়া জেলার মেহেরুপুর মহকুমার গাড়াডোব গ্রামে। জন্ জমিরুদ্দীন যে শুধু খ্রীস্টান হন তা নয়। তিনি তৎকালীন এলাহাবাদ সেন্টপলস্ ডিভাইনিটি কলেজে খ্রীস্ট ধর্মপ্রচার বা মিশনারী বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং কলেজের পড়া শেষ করে এইচ, জি, আর (হাইয়ার গ্রেট রিডার) বা পাঠকরত্ন উপাধি লাভ করেন এবং খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারে উঠে পড়ে লাগেন। ১৮৯২ ঈসায়ী সালে জন জমিরুদ্দীন "খ্রীস্টীয় বান্ধব" নামে একটি মাসিক পত্রিকায় "আসল কোরআন কোথায়" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে তিনি এ প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন আসল কোরানের কোথাও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আনন্দের কথা কি জান! মুন্‌সী মেহেরউল্লা তো আর বসেছিলেন না, তিনি এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন 'সুধাকর পত্রিকায়' "ঈসায়ী বা খ্রীস্টান ধোঁকা ভঞ্জন" শিরোনামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (২০শে ও ২৭শে চৈত্র ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ ১৩০০ সাল)।

কি! সে আজ থেকে একশ' চার বছর আগের কথা তাই না? সে যাক এরপর জন জমিরুদ্দীন "সুধাকর" পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর উত্তরে বিজ্ঞ মেহেরউল্লা "আসল কোরআন সর্বত্র" এই শিরোনামে "সুধাকর" পত্রিকায় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন।

এই যখন অবস্থা তখন বরিশালের পিরোজপুর মহকুমার খ্রীস্টান

www.pathagar.com

পাদ্রীগণ ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এমনকি তারা প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান করে বসলো। প্রশ্ন দেখা দিলো কে তাদের সাথে তর্ক যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? শেষ-মেষ মিহির ও সুধাকর-এর সম্পাদক মুন্‌শী শেখ রেয়াজউদ্দীন আহম্মেদ পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মুন্‌সী মেহেরউল্লাকে আহবান জানান।

এ সম্বন্ধে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর লিখিত "কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর" ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়া মেহেরুল্লাহ ১২৯৮ সালের ২১, ২২ ও ২৩ শে আশ্বিন তুমুল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাদ্রীদের পরাজিত করলেন।"

এখানে যে তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তা, "খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ" গ্রন্থে বিস্তৃত তুলে ধরা হয়। পরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।

জন্ জমিরুদ্দীনের ইসলাম গ্রহণ

তোমরা শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবে। বাক যুদ্ধেও জন্ জমিরুউদ্দীন, মেহেরউল্লার কাছে পরাস্ত হন। ক্রমে ক্রমে ইসলাম ধর্মের প্রতি জমিরউদ্দীন দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলে কোন এক শুভক্ষণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

জমিরুদ্দীন নিজে লিখেছেন–

'একদিন আমি মধুগাড়ী নামক পল্লীতে তাম্বুর মধ্যে শয়ন করিয়া কোরান শরীফের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতেছি, এমন সময় সূরা সফ্-এর ৫ আয়াতে (৬১শ সূরা) উপস্থিত হইলাম। তথায় লেখা আছে যে, 'ইসা বলিলেন,……….. আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ, যাঁহার নাম আহমদ, আগমন করিবেন। উপরিউক্ত বাক্যটি পাঠ করিতে করিতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়া দিল যে, উক্ত বাক্যটি পূর্বে বাইবেলে ছিল, কিন্তু দুষ্ট খ্রীস্টানেরা উহা বাইবেল হইতে বিয়োগ করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক বাইবেল যে পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিতে

www.pathagar.com

লাগিলাম এবং .... জানিতে পারিলাম যে, বর্তমান সময়ে কোথাও আসল বাইবেল নাই, খ্রীস্টানেরা উহা বিকৃত ও পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।' (আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত – শেখ জমিরুদ্দীন, পৃ-৬-৭)

এরপর জমিরুদ্দীন নতুন করে সত্য-ধর্ম অন্বেষণে নেমে পড়েন। তিনি খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করার কারণে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অথচ সেই খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর মনে পুনরায় অনাস্থা জন্ম নিল। তিনি নিজে লিখেছেন–

'খ্রীস্টান ধর্ম যে মিথ্যা হইবে ইহা পূর্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া হৃদয় খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা সহকারে বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি যতই বাইবেল পাঠ করি ততই যেন বাইবেলের ভ্রষ্টতা দেখিতে পাই।' (ঐ; পৃ. ১০)

এ সময়ে মুন্শী জমিরুদ্দীনের মন এতই চঞ্চল হয়ে ওঠে যে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি লিখেছেন–

'মনে মনে স্থির করিলাম যে, খ্রীস্ট সমাজে আর না থাকিয়া কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্ম মত ভাল করিয়া অবগত হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হইব। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত মিশিলাম; কলিকাতায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের আদেশানুসারে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলাম, ব্রাহ্ম মত ভাল লাগিল। (ঐ; পৃ. ১৫)

তিনি যখন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাদের সভা সমাবেশে যেতে লাগলেন, এমনি একদিন কলকাতার এলবার্ট হলে নগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মোহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম' শিরোনামে একটি আলোচনা শোনেন। মিত্র মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্মানুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনায় মুসলমানদের নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)কে আল্লাহ মনোনীত ও প্রেরিত মহাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন।

এ আলোচনা শোনার পর জমিরুদ্দীনের চিন্তা আবার নতুন দিকে মোড় নেয়। তিনি লিখেছেন– 'উপরোক্ত বাক্যগুলি আমি শ্রবণ করিয়া

www.pathagar.com

পবিত্র মুসলমান ধর্মের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরে বিশেষ বিশেষ মুসলমান ধর্ম পন্ডিতদিগের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাদের নিকটে সত্য সনাতন দীন ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করি। তাহার পরে অনেক অনেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তিভাজন মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবকৃত "রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম" ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম সাহেবকৃত "ইসলামতত্ত্ব" ১ম ও ২য় খন্ড পাঠ করনান্তর পবিত্র মুসলমান ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।' (ঐ; পৃ. ১৭)

এরপর জমিরুদ্দীন সাহেব আর কালবিলম্ব না করে পুনরায় ইসলাম কবুল করেন। এ প্রসংগে তিনি লিখেছেন–

'আমি যখন খ্রীস্টান ধর্ম মানিনা, তখন আর সমাজে থাকিব না বলিয়া মিশনারী কার্য পরিত্যাগ ও নিজ বাড়িতে আগমনপূর্বক প্রিয় আত্মীয়-স্বজন সমক্ষে মৌলবী রেয়াজ-উল হক সাহেব কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হই।' (ঐ; পৃ. ১৯)

এরপর তিনি মেহেরউল্লার সাথে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু কি তাই! এই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী অঘোরনাথ বিশ্বাস রেভারেন্ড আলেকজান্ডার প্রমুখ খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারকগণ মুন্‌সী মেহেরউল্লার সাথে তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জমিরুদ্দীনের পুনরায় ইসলাম গ্রহণের ফলে মেহেরউল্লা একজন বলিষ্ঠ সঙ্গী পেলেন। জানা যায় এই জমিরুদ্দীন সাহেব ইসলাম প্রচারের জন্য ১০৮ খানা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এবং তেরো শতের অধিক খ্রীস্টান তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মূলতঃ এ সাফল্যের জন্য বাহবা মুন্‌সী মেহেরুল্লারই প্রাপ্য। কারণ, তাঁরই চেষ্টায় পথভ্রষ্ট জন্ জমিরুদ্দীন পুনরায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুনশী মুহম্মদ জমিরুদ্দীনের পরিণত হয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে জমিরুদ্দীন নিজে লিখেছেন– 'এই সময়ে আমি "রদ্দে খ্রীস্টিয়ান" প্রস্তক ও শ্রীযুক্ত মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব সদৃশ প্রচারক পাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় খ্রীস্টান হইতাম না।' (ঐ; পৃ. ৩)

মেহেরউল্লার অগ্রযাত্রা

মুন্‌শী জমিরুদ্দীনকে ইসলাম প্রচারে সাথী হিসেবে পেয়ে মেহেরউল্লার গতি যেন ঝড়ের বেগ নিল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বিজয়ী মন নিয়ে সভা-সমিতি করে বেড়াতে লাগলেন। এ সময়ে রানাঘাট অঞ্চলে পাদ্রীদের ইসলাম বিরোধী প্রচার প্রপাগান্ডা ছিল খুব জোরালো। দলে দলে হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টান হয়ে পড়ছিল। এহেন অবস্থা দেখে ঐ অঞ্চলের মুসলমানগণ প্রমাদ গুণলেন। তারা পাদ্রী দলপতি মনোয়ার বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ করার জন্য মেহেরউল্লা ও জমিরুদ্দীনকে আহবান জানান। শুনে অবাক হবে। পাদ্রী দলপতি সভায় হাজির হননি। কারণ কিন্তু জানা যায়নি। হয়তবা জুজুর ভয়ে! এখানে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল হক তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন–

"বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়, যিনি মাঠ-ময়দান অতিক্রম করিয়া কষ্ট সহ্য করত; দূরবর্তী কৃষক পল্লীতে যাইয়া খৃস্টপ্রেম বিতরণ করিতে পারেন তাঁহার এই স্থানে গৃহের সম্মুখে আসা হইল না। সভার চতুর্দিকে বহু পুলিশ প্রহরী এবং বহু হিন্দু ভদ্রলোকের সমাবেশ। পুরোভাগে কতিপয় পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসীন। সভার পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বঙ্গ বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক বাগ্মী প্রবর মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব ও তেজস্বী বক্তা মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন পাঠকরত্ন সাহেব উচ্চাসনে সমাসীন।

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের পরিচয় অনেকেই জানেন। প্রথমে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব হামদ ও না'য়াত অন্তে বক্তৃতা করেন। ইনি অনর্গল তিন ঘন্টা বক্তৃতা করার পর মুসলমান সমাজের প্রধান বক্তা মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন। ইহার যুক্তিপূর্ণ মধুর বক্তৃতায় শ্রোতাবর্গ অতীব বিমোহিত হইয়াছিল। তাঁহারা কখনো বিস্মিত, ভীত, চমকিত কখনো বা উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিতে ছিলেন।"

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লা তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর খেদমত করে যাচ্ছিলেন। মেহেরউল্লা ও শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব ১৩০৪ সাল থেকে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত একত্রে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, চব্বিশপরগণা, যশোর, বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, সিংহল, রাজশাহী, নদীয়া, হুগলী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলা শহর ও মফস্বলের ধর্ম সভায় বক্তৃতা করে বেড়ান।

বক্তৃতা জগতের এই অগ্রদূত মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা জনগণের অন্তরের এত কাছে পৌঁছেছিলেন যে, ১৩০৫ সালের শেষ ভাগে নোয়াখালীর পাদ্রীরা মুসলমানদের কাছে কতকগুলো প্রশ্ন রাখে। জনাব মেহেরউল্লা তাঁর সঠিক উত্তরে দেন। এরপর পাদ্রীরা আর এগুতে সাহস পায়নি।

তাঁর নোয়াখালীর সভা-সমিতি সম্বন্ধে জনৈক কবি আবদুর রহিম তাঁর "আখলাকে আহম্মদীয়া" নামক গ্রন্থে মেহেরউল্লার গুণগান গেয়েছেন–

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম।।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার।।
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু খৃস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া।।
মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া।
অসার তাদের দ্বীন দিল যে ছাড়িয়া।
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন জ্ঞানের ভান্ডার।।
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তের শত পাঁচ সাল ছিল বাংলার।
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে
এসেছিল নোয়াখালি শহর বিচেতে।।

বুঝতেই পারছো, মুন্সী মেহেরউল্লা কিভাবে সমাজের সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়োছিলেন। তাঁর চেষ্টা তদবিরের ফলে কত পথ ভ্রান্ত মানুষ যে পথের দিশা পেয়েছিল, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। মুন্‌সী সাহেবের কীর্তি গাঁথা তাই গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফিরত। আসলেই তিনি মুসলমানদের দুর্দিনে সত্যিকার বন্ধুরূপেই তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

সমাজ সংস্কারক মেহেরউল্লা

সমাজের ভিতর কুসংস্কার একটা ব্যাধিস্বরূপ। মুন্‌সী মেহেরউল্লা উপলব্ধি করেন, মুসলিম সমাজেও এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর সমূলে বিনাশ প্রয়োজন। তিনি বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে এগুলো সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন।

এ সম্পর্কে আসির উদ্দীন প্রধান তাঁর একটি সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন–'সভার প্রথম দিন দুই, তিন সহস্র ও দ্বিতীয় দিন তিন চার সহস্রের ওপর লোক সমবেত হইয়াছিল। তৎপর স্বনামধন্য বক্তা বাগ্মী কুলতিলক মুন্‌সী সাহেব মগরেবের নামাজ অন্তে দন্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম-ব্যবসা বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মোক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্প শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চ্চা, সভা সমিতির উপকারিতা, বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।'

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর "কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ" গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মেহেরুল্লাহর নানা দিকে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। 'মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে, কিন্তু তৈয়ার করিতে জানেনা। পান খাইয়া অজস্র পয়সা নষ্ট করিতে জানে, কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করে।' মুন্‌সী সাহেব

www.pathagar.com

মুসলমানগণের মিঠাইয়ের দোকান করিতে, পানের বরজ তৈয়ার করিতে সর্ব স্থানেই উৎসাহ দিতেন। তাঁর চেষ্টা বহুস্থানেই ফলবতী হইয়াছিল।"

ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করে তাদের তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এই জন্যেই তাঁর বাড়ির কাছাকাছি এক ফকির এসে আস্তানা গাড়লে তিনি তার বিরুদ্ধে ছোট একটা বই লিখে তাকে উঠিয়ে দেন।

শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা নিজেই সারাজীবন শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান তৃষ্ণা এত প্রবল ছিল যে, তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে বাংলা আসামের অলিতে গলিতে। তার লেখা ও বক্তৃতা থেকেই জানা যায় 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়া মেহেরউল্লা কত বেশী পড়াশুনা করেছিলেন। এই জ্ঞান সাধক কিন্তু নিজে জ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি সমাজের মানুষকেও আহ্বান জানান "শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে জাতি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয় না আর যাই হোক, সে জাতি সমাজে মাথা উচু' করে টিকে থাকতে পারে না।" তাই তো দেখী মুন্‌সী সাহেব নিজ গ্রামের পাশেই চূড়ামনকাটিতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, একজন প্রভাবশালী হিন্দুর বিরোধিতার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তোমরা হয়তো মনে করছো মেহেরউল্লা ভেঙ্গে পড়েছিলেন! আসলে মোটেও তা নয়। তিনি তার পাশেই বর্তমানে ক্যান্টনমেন্টের এ্যায়ারফোর্স এলাকার ভেতর মনোহরপুর নামক স্থানে ১৩০৭ সালে পীর মাওলানা কারামত আলীর নাম অনুসারে "মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া" নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা স্থাপন করতে গিয়ে মুন্‌সী সাহেবের দারুণ বেগ পেতে হয়। দ্বারে দ্বারে ঘুরে মাত্র ৮৩টি টাকা তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। অথচ মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য খরচ হয়েছিল দুইশত টাকারও ওপরে! তিনি ছিলেন মাদ্রাসা কমিটির সেক্রেটারী। বাকী টাকা তিনিই দিয়েছিলেন। প্রতিমাসে এই মাদ্রাসার

www.pathagar.com

পিছনে ৪০টাকা মত খরচ হত। এ টাকাও আজীবন মুন্সী সাহেবই দিতেন।

মুসলমানদের দরদী নেতা যখন দেখলেন এ জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী। অথচ মুসলমান শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা পাঁচজন হবে না। তখন তার মন কেঁদে উঠলো। তাই তো তিনি স্থাপন করলেন "মাদ্রাসায়ে কারামতিয়া!" ছাত্র সংগ্রহের জন্য তিনি নিজেই ছুটে বেড়াতে লগালেন বাড়ি বাড়ি। সাধারণ মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন শিক্ষার গুরুত্ব। তা ছাড়া তাদের লজিংয়েরও ব্যবস্থা করলেন। নিজের বাড়িতেই একাধিক ছেলের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

তিনি ছেলেদের পিতাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমানেরা অশিক্ষিত হওয়ার কারণে ধূর্ত মহাজন, বরকন্দাজ, নায়েব, গোমস্তা, জমিদারগণ তাদের সহজে ঠকাতে পারে। তারা যদি শিক্ষার আলো পাই তাহলে মুসলিম জাতি এই অবস্থা থেকে ইনশাল্লাহ রেহাই পাবে।

ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ফল স্বরূপ অল্প শিক্ষিত মৌলবীরা ইংরেজী ভাষাতো শিখতেই চাইতো না, সেই সাথে বাংলাকেও অবহেলা করতো। বিজ্ঞ মেহেরউল্লা দেখলেন এটা মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে এব্যাপারে বুঝানোর জন্য জোর চেষ্টা চালালেন। মুন্সী সাহেব তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'মাতৃভাষা বাংলা লেখা পড়ায় তাদের এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমান জনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারা যে কি দৃশ সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

তিনি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কোন ভাষাকেই ঘৃণা করতেন না। তার প্রমাণ 'বোধোদয়" পর্যন্ত পড়া মেহেরউল্লা আরবী, ফারসী, উর্দু, এমনকি ইংরেজীতেও বুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু বাংলাকে তিনি সমধিক গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিতেন। কারণ তিনি জানতেন, মাতৃভাষায় কোন জিনিস বোঝা যত সহজ, ভিন্ন ভাষায় তত সহজ নয়। তাই তিনি বাংলায় মিলাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর 'মেহেরুল এসলামে' লিখিত নবী প্রশস্তি নায়াতে রসূলোল্লাহ, নায়াতে মোস্তফা আলায়হেচ্ছালাম যখন তার সুলোলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হতো তখন সবাই ঐ কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে গেয়ে উঠত।

গাওরে মোসলেমগণ নবীগুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছল্লে আলা গাওরে
আপনা কালামে নবীর সালামে তাকিদ করেন বারী
কালেবেতে জান কহিতে জবান যে তক থাকে গো-জারী
যে বেশে যে ভেসে যে দেশেতে যাওরে
গাও গাও গাও সবে ছল্লে আলা গাওরে।
হযরত আদম, গোনাতে যে দম বেদম কাঁদিয়াছিল
পাইল রেহাই মোস্তফা দোহাই যে দমে দিয়াছিল
তাই বলি পাপী যদি পাপ ক্ষমা চাওরে
ত্বরা করি প্রাণ ভরি ছল্লে আলা গাওরে।
নূহ পয়গম্বর, হুকুমে আল্লাহর জাহাজ বানান যবে
উপরে তাহার, নাম মোস্তফার নিখিলে ভাসিল তবে
ভব পার যেতে কার বাসনা সে আওরে
হৃদয় জাহাজে লিখে নবী গুণ গাওরে।
খলিলের পেশানীতে নবী নূর, নেশানীতে আলোকিত ছিল হায়।
আহা সেই নূর বলে নমরুদের মহানলে খলিলুল্লাহ মুক্তি পায়।
ওহে ভাই, জাহান্নামে যেতে যে না চাওরে
আজীবন মনে প্রাণে নবীগুণ গাওরে
ফেরেস্তা সইস হয়ে, যাঁহার বোরাক লয়ে আসিল এ দুনিয়ায়
তিনি যে কেমন জন, ভাব হে ভাবুকগণ, তাঁহার মিছিল দিব কায়
বোরাকে ছেরাতে পার যাইতে যে চাওরে
বদম ভরিয়া সেই ছল্লে আলা গাওরে।

কী আনন্দে যে লাফিয়ে উঠলে? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো সেই গজল

www.pathagar.com

যে গজল তোমরা, আমরা সবাই বিভিন্ন গজলের বই থেকে সুর করে পড়েছি।

তিনি কিন্তু মিলাদেরও প্রবর্তক ছিলেন। তাহলে তাঁর কণ্ঠেই শোন-

"কোথায় আরব ভূমি, কোথা বা আমি, কোথা তুমি
পাব কি তোমার আমি
মুহম্মদ ইয়া রাসুলুল্লাহ।
সমস্ত জগত মাঝে, তব ডঙ্কা জোরে বাজে
মুহম্মদ ইয়া রসুলুল্লাহ।"

কী? হতবাক কেন? তিনি এ ভাবেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সঃ) কে ভালবেসেছিলেন এবং নায়েবে রসুল হিসাবে আজন্ম কাজ করে গেছেন।

মেহেরউল্লার ব্যক্তিজীবন

সাদা সিদে সরলমনা একজন মানুষ ছিলেন মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। আজকালকার বক্তাদের মত তিনি বাহারে পোষাক কখনই পরতেন না। বলা চলে একেবারে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন তিনি। সাধারণ মানুষের মতই তিনি নিজের জীবন যাত্রার বিষয়টা বেছে নিয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও ছিলেন সাধারণ। বেশী খরচ করাকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি কোথাও অতিথি হলে মোটেই বেশী খরচ করতে দিতেন না। বলতেন, 'আলুর ছানাই যথেষ্ট।'

জীবনে তিনি প্রচুর টাকা পয়সা আয় করেছেন। কিন্তু কৃপণদের মত তা আগলে রাখেননি। সব কিছুই জনহিতকর কাজে লাগিয়েছেন। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে, তাঁর বংশধরদের জন্যেও তিনি কিছুই রেখে যাননি। এ সম্বন্ধে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন "মেহের চরিত" গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায়

www.pathagar.com

লিখেছেন, 'অপব্যয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। সামান্য পোষাক পরিধান করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন এবং সামান্য আহার করিতেন। দুঃখীর আর্তনাদ তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও তাঁহার নিকটে কোন বিষয়ে প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হয় নাই।"

জানা যায়, জামায়াতে ইমামতীর জন্য তিনি নিজে কখনো এগিয়ে যেতেন না। যদি মনের ভেতর কোন অহংকার এসে যায়, এই ভয়ে। তিনি সব সময় চিন্তা করতেন কিভাবে সমাজের মানুষের মঙ্গল হবে? কিভাবে তারা ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি পাবে?

মোহাম্মাদ আছির উদ্দীন প্রধান এ প্রসংগে একটি অত্যন্ত সত্য কথাই বলেছেন।

"সমাজ ও ধর্মোন্নতির মঙ্গল ও সুনাম কামনায় সতত সচেষ্ট থাকিয়া ভাষণ একাগ্রতার দুরুহ দুরুহ বিপদ মস্তকে বহন করিয়া বঙ্গীয় ইসলাম বর্গকে সর্বাঙ্গীন রূপে গৌরবান্বিত করিতে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন; শিক্ষা ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা করা আমাদের কতদূর যে প্রয়োজনীয় এবং এ দ্বারা কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহা সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যমন্ডলীকে মর্মে মর্মে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহার পদানুসরণে দুর্লভ যশ প্রভাব আলোকিত হইতে অশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। যখন তিনি মুসলমান সমাজের দুর্দশার বিষয় ক্ষোভোদ্দীপক ভাষায় অতিশয় অনুতাপের সহিত ব্যক্ত করিতেন, তখন সভার মধ্যে যেন শোক মহামারী মূর্তিতে সকলের হৃদয়ই অভিভূত হইয়া পড়িত এবং যাহাতে এরূপ পাপ রাক্ষসের কবলে পতিত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতাসহ পদক্ষেপ করিতেন।"

মুন্‌সী মেহেরউল্লা পরের দুঃখের প্রতি এত কাতর ছিলেন যে একটা ঘটনা থেকেই তাঁর প্রমাণ মেলে। এক অন্ধ ভিখারী কোন এক পথের ধারে সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়ে ভিক্ষা করছিলেন কিন্তু কোন দুষ্ট ছেলে এই বাতিটি চুরি করে নিয়ে যায়, ভিখারী এ খবর জানতো না। টের পেল তখনই, যখন পথিক তাঁর শরীরের ওপর চড়াও হলো। ভিখারী ব্যথায় কাঁকিয়ে উঠলো। এমন সময় মুন্‌সী মেহেরউল্লা ঐ পথ দিয়ে চলছিলেন।

www.pathagar.com

এহেন দুঃখজনক ঘটনার তিনি নিজেই কেঁদে ফেললেন। তৎক্ষণাত তিনি একটি বাতি সংগ্রহ করে আনলেন। কিন্তু সলিতা পাবেন কোথায়? অগত্যা কোন পথ না পেয়ে নিজের লুঙ্গির খানিকটা ছিঁড়ে সলিতা তৈরী করলেন এবং অন্ধের সামনে আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়ালেন।

এ প্রসংগে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করছি এ জন্যেই যে, দুঃখীর দুঃখ তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। মোট কথা তিনি দুঃখীর বন্ধু ছিলেন- একদিন নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলার একটি বালক কূপের ভেতর পড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে মানব দরদী মুন্সী সাহেব তাকে বাঁচানোর জন্য কূপের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতিকষ্টে বালকটি উদ্ধার করেন এবং অন্যের সাহায্যে নিজেও উদ্ধার পান।

বুঝতেই পারছো মেহেরউল্লা কেমন দরদী ছিলেন, তোমরা বড় হলে এমন অনেক ভাল কাজ করবে নিশ্চয়?

ব্যক্তি জীবনে তিনি একনিষ্ঠ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু বিদ্বেষী বা বিধর্মী বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর সমস্ত সভাসমিতিতে অগণিত হিন্দু খৃস্টানের সমাগম হত। এ প্রসংগে হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন বলেছেন, "১৩০৮ সালের ২৮শে মাঘ তারিখে রংপুর টাউনে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় হিন্দু মুসলমান সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মুন্সী সাহেব মরহুম ঐ সভায় গো হত্যা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত হিন্দুরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অন্তে স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত যাধবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বক্তার গলায় গলা মিলাইয়া তাঁহার শত শত প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

মেহেরউল্লার উপস্থিত বুদ্ধি

সদা কৌতুকপ্রিয় মুন্সী মোহম্মদ মেহেরউল্লা অনেক পাদ্রী এবং হিন্দুদের প্রশ্নের এমনি জবাব দিতেন যে এক পক্ষ উল্লাসে ফেটে পড়তো

www.pathagar.com

আর অপর পক্ষ মাথা নীচু করে বসে থাকত। কোন স্থানে সভা হবে এবং সেখানে মুন্সী মোহম্মদ মেহেরউল্লা আসবেন এমন সংবাদ পেলে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীস্টানগণ সেখানে দলে দলে যোগদান করতেন। যেমন বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কোন বক্তা আসলে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। এমনি ধরনের সভাগুলোতে অনেক সময় মুন্সী সাহেবের নিকট উদ্ভট প্রশ্নের বাণ ছোড়া হতো। মুন্সী মেহেরউল্লার কনিষ্ঠপুত্র আলহাজ্ব মুন্সী মোখলেসুর রহমানের ভাষায় এ প্রশ্নগুলো ছিলো "মেঠো প্রশ্ন"। আর উত্তরও অনেক সময় সেই রকমই হতো। বর্তমানে এ প্রশ্ন-উত্তরগুলো যশোর জেলার পল্লীতে পল্লীতে গল্পের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারই দু'একটা তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কার নবী বড় ?

এক সভায় পাদ্রীগণ তাদের নবী যীশু খ্রীস্টকে বড় বলে দাবী করলো। কারণ স্বরূপ বলা হলো তাদের নবী আসমানে উঠে গেছেন এবং মুসলমানদের নবী জমিনে (কবরে) আছেন।

সভাস্থলে থম থমে ভাব, মুন্সী সাহেব কি উত্তর দিবেন?

উত্তর দিলেন, 'পাদ্রী ভাই এর কথায় ঠিক, নইলে উনাদের নবী উপরে উঠবেন কেন?' এবং তিনি সভার শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আচ্ছা ভাই সকল, আপনারা একসের ও পাঁচসের নিশ্চয় চেনেন?'

সবাই হাত উঁচু করে সম্মতি জানালো। তিনি একটা দাড়িপাল্লা আনতে বললেন, পাল্লা আনার পর একসের এক পাশে এবং পাঁচসেরটি অন্য পাশে রাখা হলো। যা হবার তাইই হলো। একসের যে পাশে সে পাশ ওপরে উঠে গেলো। আর যে পাশে পাঁচসের ছিলো সেটা স্বাভাবিক ভাবেই নীচে থাকলো। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন একসের বড় না পাঁচসের? মুসলমানেরা উল্লাসে চিৎকার দিয়ে বললো, পাঁচসের। খ্রীস্টানেরা আর টু শব্দটি করলো না।

www.pathagar.com

কার নবী দরদী ?

পাদ্রীগণ একবার দাবী করলো যে, তাদের নবী তাদের প্রতি বেশী দয়া পোষণকারী। যার কারণেই তিনি আসমানে উঠে গেছেন, যাতে করে তাঁর অনুসারীগণ বেহেস্ত লাভ করতে পারে।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা মঞ্চে আরোহন করেই বললেন, সত্যিই পাদ্রী ভাইদের নবী দরদে আপ্লুত। তাই তো দেখি দলবল ছেড়ে স্বার্থপরের মতো আসমানে উঠে বসে আছেন। আচ্ছা ভাইয়েরা, 'আপনারা মুরগী চেনেন, মুরগী? খেয়াল করলে দেখে থাকবেন, মুরগীর বাচ্চা খাওয়ার জন্য যখন বাজ বা চিল আসে তখন কিছু মুরগী বাচ্চা ছেড়ে কট্ কট্ শব্দ করতে করতে নিজে বাঁচার জন্য গাছের মগডালে চড়ে বসে। আর কতকগুলো মুরগী আছে যারা এরূপ বিপদের সময় বাচ্চাগুলিকে ডানার মধ্যে নিয়ে সাবধান করে। বুঝতেই পারছেন পাদ্রী ভাইদের নবী কট্‌কটে মুরগীর মতো। যার মনে মায়া মমতা বলতে কিছুই নেই। আর আমাদের নবীর উদাহরণ দ্বিতীয় প্রকার মুরগীর মতো তিনি তার উম্মতকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাই এক সাথেই কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবেন। কি পাদ্রী ভায়েরা সন্তুষ্ট তো?

পায়খানা করবো কোথায়?

একবার হিন্দু ভাইয়েরা ফন্দি আঁটলো মুসলমানদের ঠকানোর জন্য। সে সময় বনগাঁ অঞ্চলের কোন এক জায়গায় সভা ছিলো, যার বক্তা ছিলেন মেহেরউল্লা। তাই হিন্দু ভাইয়েরা ঠিক করলো যে, প্রশ্ন করা হবে পায়খানা করবো কোথায়? উত্তর আসবে নিশ্চয় বাগানের ভেতর। এ ধরনের উত্তর আসলে আমরা (হিন্দুরা) সবাই হো হো করে হেসে উঠবো, যে মুসলমানদের মুখেই তো বাগান অর্থাৎ দাড়ি আছে তা হলে ....।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা বক্তৃতা দিতে দিতে প্রশ্নটি শুনলেন। বললেন উত্তর দেবো পরে। অগ্নিঝরা বক্তব্য রাখছেন মেহেরউল্লা। সবাই নিবিষ্ট মনে শুনছেন সে বক্তৃতা। হঠাৎ ছন্দ পতন।

www.pathagar.com

মেহেরউল্লা বললেন, 'হিন্দু ভাইসব তোমাদের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, বাগানকে সামনে রেখে পরিষ্কার পরিছন্ন জায়গায় পায়খানা করতে হবে।'

তার্কিক মেহেরউল্লা তাদের কোথায় ডুবালেন অর্থাৎ হিন্দুদের গোঁফকে সামনে রেখে দাড়ি চাছা মুখের উপর পায়খানা করার কথা বললেন। অতএব হিন্দুরা হোতার মুখ ভুতা করে বসে রইল।

বেহেশ্ত, দোযখ

এক ধর্ম সভায় মুন্সী মেহেরউল্লার নিকট প্রশ্ন করা হলো, 'আচ্ছা ভাই আপনারা বলে থাকেন শুধু মাত্র মুসলমানরাই বেহেস্তে যাবে। তাও যারা নাকি মুমীন মুসলমান। আবার বলেন বেহেস্তের সংখ্যা ৮টি এবং দোযখের সংখ্যা ৭টি। কিন্তু কথা হচ্ছে মুমীন মুসলমানের সংখ্যা যা হবে সেই তুলনায় বহু বহুগুণ বেশী হবে দোযখীদের সংখ্যা। তাহলে কি করে ৭টি দোযখে এতগুলো মানুষ ধরবে? আর মাত্র কিছু সংখ্যক বেহেস্তীর জন্যই বা বেহেস্তের সংখ্যা বাড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল?

মুন্সী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'আল্লাহই ভাল জানেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে এখন উত্তর দেব না। কারণ এটা আপনারাই বের করে নিতে পারবেন। আমি অন্যভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা 'বুনো'দের বাদুড় ধরা দেখেছেন? এরা রাত্রিতে গাছে জাল পেতে প্রচুর বাদুড় ধরে। রাখে কিসে জানেন? বাদুড়গুলো বস্তার ভেতর ঠেসে ঠেসে রাখা হয়। এরপর কথা হচ্ছে ময়না পাখিও নিশ্চয়ই চেনেন? আর না চিনলেও নামতো শুনেছেন। এদের কোথায় রাখা হয় জানেন? সুন্দর পরিপাটি বড়সড় খাঁচার ভেতর।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনারা যারা দোযখীদের খাতায় নাম লেখাতে চান তারা বাদুড় সদৃশ। আর আমরা যারা বেহেস্তীদের খাতায় নাম লেখাতে চায় তাঁরা ময়না সদৃশ। চতুর্দিকে থেকে ধ্বনিত হল, মারহাবা মারহাবা।

www.pathagar.com

আল্লাহ কি সর্বত্র বিদ্যমান?

তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসনাকার হিন্দু ভায়েরা একবার প্রশ্ন রাখলেন, আল্লাহ যদি একজন হন তা'হলে তিনি কি করে সৃষ্টির সব জায়গায় বিদ্যমান থাকতে পারেন একথা আমাদের বুঝে আসে না-

মুন্সী মেহেরউল্লা বললেন, হিন্দু ভাইয়েরা একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছেন? এর উত্তর তো একেকবারে সোজা। আচ্ছা, আপনারা সূর্য দেখছেন তো? সূর্য কয়টা? নিশ্চয় একটা! এখন যদি আমরা সবাই একটা করে আয়না ধরি সূর্যের দিকে, তা'হলে কি, সূর্য প্রতিটি আয়নার ভেতর দেখা যাবে না? তাই যদি হয় তা'হলে একটা সূর্য কি করে কোটি কোটি আয়নার ভেতর যেতে পারে? এবার বলুন বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি কি সবজায়গায় বিরাজমান হতে পারেন না? কি মনের ঘোর কাটলো তো?

আল্লাহ কি পবিত্র?

খ্রীস্টান ভাইয়েরা এক সভায় প্রশ্ন করলেন, 'প্রিয় মুসলমান ভাইগণ, আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহ সবজায়গায় বিদ্যমান। তাই যদি হয় তা'হলে তিনি তো প্রস্রাব পায়খানার মধ্যেও বিদ্যমান। তা'হলে কি তিনি অপবিত্র নন?'

প্রশ্ন শুনে মুন্সী মেহেরউল্লা সভামঞ্চ ত্যাগ করলেন। মুসলমানগণ হাহুতাস করে উঠলো, হায়! জাত বুঝি এবারই গেল। কিন্তু না খানিকক্ষণ পরেই মুন্সী সাহেব ফিরে এলেন। তবে অবস্থাটা দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেলেন, মুন্সী সাহেব একটা হাড়ি হাতে করে মঞ্চে আরোহণ করলেন। কৌতুহুলী দর্শকবৃন্দ ঘটনার ফলাফল জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মুন্সী সাহেব পাদ্রী দলপতিকে আহবান করলেন এবং হাড়ির ভেতর কি আছে দেখার জন্য অনুরোধ জানালেন। পাদ্রী দলপতি হাড়ির মুখ খুলে তাতে পানির মত কিছু দেখতে পেলেন-

মুন্সী সাহেব প্রশ্ন করলেন কিছু কি দেখলেন?

পাদ্রী- দেখলাম পানির মত কিছু

www.pathagar.com

মুন্সী- আর কিছু?

পাদ্রী- কই না তো?

মুন্সী- ভাল করে দেখুন।

পাদ্রী- হ্যাঁ আমার ছবি দেখতে পাচ্ছি।

মুন্সী মেহেরউল্লা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'মিস্টার নামুন নামুন। আপনি অপবিত্র হয়ে গেছেন। হাড়িতে কি আছে জানেন? এই কেবল মাত্র পেশাব করে তাই নিয়ে এলাম। আর সেই পেশাবের ভেতর আপনার ছবি দেখা গেছে অতএব আপনি অপবিত্র হয়ে গেছেন। খ্রীস্টানগণ বুঝলো কোথায় ঘা দিলেন মেহেরউল্লা সাহেব!

গালে চড়

একবার এক সভায় পাদ্রী দলপতি মুসলমানদের গুণ্ডা বলে আখ্যায়িত করলেন। কারণ মুসলমানরা খুনের বদলা খুন দিয়েই নিয়ে থাকে। চড়ের বদলা চড় দিয়েই। পক্ষান্তরে খৃস্টানরা সহানুভূতিশীল। তাদের ধর্মে বলে একগালে চড় দিলে অপর গাল পেতে দাও।

মেহেরউল্লা মঞ্চেই ছিলেন পাদ্রী দলপতির এই সুন্দর বাক্যটি শুনার পর তিনি মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে পাদ্রী দলপতির গালে একটা আড়ই মন ওজনের চড় বসিয়ে দিলেন এবং আর একটা অন্য গালে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন– কিন্তু সে সুযোগ আর হল না, সভায় গণ্ডগোল দেখা দিল। পাদ্রী দলপতি গোস্বায় জ্বলতে লাগলেন। অবস্থা আয়াত্তে আসলে মেহেরউল্লা বললেন, 'আপনাদের ধর্মেরই বিধান কার্যকরী করার চেষ্টা করছিলাম। আর এতেই চটে গেলেন?'

চেহারা ছুরাত

একদিন এক পাদ্রী সাহেব মুন্সী সাহেবকে ঠকানোর জন্য বললেন– আচ্ছা মুন্সী সাহেব আপনি হয়তো খেয়াল করে থাকবেন আমাদের

www.pathagar.com

চেহারা, শরীরের গঠন কত সুন্দর। সবাই প্রায় এক ধরনের অথচ মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের চেহারা কারো সুন্দর, কারো কালো, কারো নাক বুচা, কারো থ্যাবড়া, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, এরকম কেন'?

মুন্সী সাহেব হেসে উত্তর দিলেন- এইটুকু বুঝলেন না, আপনারা বানরের বংশধর আর আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদমের বংশধর। মানুষের চেহারা তো আর এক ধরনের নয়, এক এক জনের এক এক রকম এই আর কি?' উত্তর শুনে পাদ্রী তো বিস্ময়ে হতবাক।

দেবতার তেজ

এবার তোমাদেরকে একটা সুন্দর আনন্দদায়ক ঘটনা বলছি- একবার এক পাদ্রী এক সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে দেখে কি এক হিন্দু ব্রাহ্মণ তাদের দেবতা তুলশী গাছকে প্রণাম করে সভামঞ্চে আরোহণ কললেন- ঘটনায় পাদ্রী কৌতুক অনুভব করলেন এবং ঠাট্টার ছলে গিয়ে তুলশী গাছটি ছিড়ে নিজের সর্বাঙ্গে ডলাডলি করার পর হাসতে হাসতে বললেন, হিন্দু দেবতার তেজ দেখছিলাম। মুন্সী মেহেরউল্লা ব্যাপারটা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দেখলেন। পরে একদিন হয়েছে কি, ঐ পাদ্রীর সাথে মুন্সী সাহেবের একই সভায় দাওয়াত, যথা সময়ে দুইজন এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মুন্সী মেহেরউল্লা পার্শ্ববর্তী একটা বিচুটি (চুতরা) গাছের চতুর্দিক বার তিনেক পাক দিয়ে একটা সেজদা করে মঞ্চে আরোহণ করলেন। হিন্দু দেবতার তেজ পরীক্ষার পর পাদ্রী সাহেবের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি মুসলমান দেবতার তেজ পরীক্ষার জন্য বিচুটি গাছটি তুলে সর্বাঙ্গে ডলাডলি করলেন। কিন্তু মুসলমানের দেবতা (?) পাদ্রী সাহেবকে মোটেও খাতির করলো না- কয়েক সেকেণ্ড পরই পাদ্রী সাহেব দু'চারবার ওপরের দিকে লাফ দিয়েই ধরাশায়ী হলেন। চিৎগড় উপুড় গড় দিতে দিতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন- মুসলমানের দেবতার কি তেজরে বাবা? এদিকে সভার দর্শক মণ্ডলী তো হেসে কুটি কুটি।

www.pathagar.com

জুতা চুরি

উপস্থিত বুদ্ধির পর্বটা মুন্সী সাহেবের বন্ধু শেখ ফজলল করীম সাহেবের নিজের জীবনের একটা ঘটনা দিয়েই শেষ করছি শেখ ফজলল করীম নিজেই বলেছেন।

"কাকিনার সভায় ঘটনাক্রমে আমার নূতন বিলাতী জুতা জোড়া হারাইয়া যায়। আমি জনৈক বন্ধুর জুতা পায়ে দিয়া পথে আসিতে আসিতে মুন্সী সাহেবকে রহস্যচ্ছলে বলিলাম, যান আপনার বক্তৃতায় আজ কিছু হয় নাই। চুরি সমন্ধে এত নীতি কথা শুনিয়াও যখন চোরে আমার জুতা জোড়া লইয়া গেল, তখন কি করিয়া বুঝিব যে আপনার কথায় কাজ হইয়াছে?

মুন্সী সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেনঃ ভাই ওটি আমার দোষ নয়, আপনার কর্মের ফল। এই মাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আসিলেন, আর আপনার নিজের পায়ে দামী বিলাতী জুতা। এই চোর উহা চুরি করিয়া আপনাকে এই উপদেশ দিয়া গেল যে, আগে নিজে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়িতে উপদেশ দিও।"

গাল্পিক মেহেরউল্লা

ইসলামের সঠিক রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য মুনসী মেহেরউল্লা বাংলা আসামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন জলসায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আলোচনা করেছেন, এই আলোচনাকালে শ্রোতাদেরকে বুঝানোর জন্য তিনি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের গল্প শুনাতেন। মুন্শী মেহেরুল্লাহ অসাধারণ রসিক ছিলেন। তিনি নিজস্ব ঢংয়ে রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারতেন। শ্রোতা সাধারণ তাঁর উপস্থাপিত গল্পগুলো গোগ্রাসে গিলতেন। তবে, তিনি শুধুমাত্র আনন্দদানের জন্যে গল্প বলতেন না। তিনি এ গল্পের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস

www.pathagar.com

পেতেন। গল্পগুলোর কিছু এখনো দক্ষিণ বঙ্গের গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত আছে। এখানে তার দু'একটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

সবুরে মেওয়া ফলে

কোন এক রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর অন্দরে চলছে গানের জলসা। কিন্তু গায়করা গানের আসরকে ঠিক জমাতে পারছেন না। ফলে তেমন পুরস্কার আসছে না। ওদিকে আসর না জমলে, গান পছন্দ না হলে পুরস্কার তো দূরের কথা শাস্তি অবধারিত। এখন উপায় কি ? গায়কদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় প্রধান গায়ক একটা গান ধরলেন। গানটির মর্মার্থ হল– প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলে অর্থাৎ ধৈর্য ধরে কাজ করে গেলে সাফল্য আসবে। উপদেশমূলক এ গানটি শেষ হলে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

রাজকন্যা গায়ককে দিলেন তাঁর গলার মূল্যবান হার। রাজপুত্র দিলেন প্রচুর টাকা। অপরদিকে কোটালপুত্র ঘটালেন অন্য কাণ্ড, তিনি তাঁর পিতার মুখে চপেটাঘাত করলেন। আর কোটাল মহাশয় এই পুত্ররত্নকে নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। এ সমস্ত ঘটনা দুর্ঘটনা দেখে রাজবাড়ির লোকজনের তো চোখ ছানাবড়া। খোদ রাজা মহাশয় গেলেন ক্ষেপে, তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টেনে ঘোষণা দিলেন, প্রকাশ্য রাজদরবারে আজকের কাণ্ড-কারখানার বিচার করা হবে।

বিচার সভা চলছে। রাজকন্যা, রাজপুত্র, কোটালপুত্র, কোটালসহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রাজা রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাজকন্যা, তা ছাড়া অবিবাহিতা, তুমি যে কাণ্ডটি করেছ তার শাস্তি কি হওয়া উচিত তা কি চিন্তা করে দেখেছ ? তুমি কি একজন গায়কের গলায় তোমার গলার হার পরিয়ে দিয়ে অপমানের একশেষ করোনি?

রাজকন্যা জোড় হাতে সবিনয়ে বললেন, অভয় দিলে এর রহস্য খুলে বলতে পারি। রাজা অভয় দিয়ে বললেন, বলতে পার। অভয় পেয়ে রাজকন্যা শুরু করলেন, আপনার জানা আছে যে, আমার যথেষ্ট বয়স

www.pathagar.com

হয়েছে। বিগত যৌবনা না হলেও যায় যায় অবস্থা। অথচ আপনি এখনো আমার বিয়ের কোন ব্যবস্থা করেননি। এ জন্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম– আজ রাতেই কারো হাত ধরে আপনার মুখে চুনকালি দিয়ে রাজপুরী থেকে বের হয়ে যাব। কিন্তু যখন গায়ক প্রবর তার গানের মধ্যে সবুরে মেওয়া ফলার উপদেশ দিলেন তখন আমার গৃহীত সিদ্ধান্ত ত্যাগ করলাম। ভাবলাম, দেখিই না আর একটু সবুর করে, পিতা হয়ত শিগগিরই পাত্র সন্ধান করবেন। তা ছাড়া যৌবন তো এখনো বিদায় নেয়নি। তাই সন্তুষ্ট হয়ে হারটি গায়ককে উপহার দিয়েছি। এখন বলুন, আমি কি কোন অন্যায় করেছি ? অনুতপ্ত রাজা তার ভুল স্বীকার করে বললেন, অন্যায় আমারই হয়েছে মা। দ্রুত তোমার বিয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এবার রাজা রাজপুত্রের দিকে মুখ ঘুরালেন এবং বললেন, কেন তুমি প্রচুর পরিমাণ টাকা গায়ককে উপহার দিলে ?

রাজপুত্র বললেন, আপনি জানেন, আমি পরিণত বয়সে এসে পৌছেছি। জনগণের খেদমত করার বয়স এটা। অথচ আপনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের গুরুভার বয়ে বেড়াচ্ছেন, আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। সে জন্য আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, আজ রাতে আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করবো। কিন্তু গায়কের উপদেশমূলক গানটি শুনে মনে করলাম, করি না আরেকটু সবুর, হয়ত তাড়াতাড়িই মেওয়া ফলবে। এখন বলুন, গায়ককে উপহার দিয়ে আমি কি কোন অন্যায় করেছি।

রাজা বললেন, না বাবা ! তুমি কোন অন্যায় করোনি। ক্ষমতার লোভ আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। তাই ক্ষমতা উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে না দিয়ে নিজে আঁকড়ে আছি। অন্যায় মূলত আমিই করেছি।

রাজা কোটালপুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি খবর ?

কোটালপুত্র সবিনয়ে বললেন, রাজা মহাশয়, আমার পিতা আমাকে লেখাপড়া শেখাননি। ফলে অনেক কিছু থেকে আমি বঞ্চিত হই। যেমন গত রাতে রাজকন্যা ও রাজপুত্র সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিল। কিন্তু অশিক্ষিত হওয়ার কারণে আমি গানের মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। এজন্য

www.pathagar.com

গায়ককে উপহারও দিতে পারিনি। আর এই না পারাটাই আমাকে রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কাছে ছোট করে দিয়েছে। এ জন্য আমি আমার পিতাকে চপেটাঘাত করেছি। এখন বলুন, আমি কোন অন্যায় করেছি কি না।

সর্বশেষে রাজা কোটালের দিকে তাকালেন, কোটাল জোড় হাতে বললেন, মহারাজ, আমার মূর্খ পুত্র আমাকে যে খুন করেনি বরং শুধুমাত্র চপেটাঘাত করেই ক্ষান্ত হয়েছে এ জন্যই আমি তাকে কোলে নিয়ে ধেই ধেই করে নেচেছি। এখন দেখুন, যদি এটা কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তবে এই বান্দা হাজির। যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।

এ গল্প থেকে এ শিক্ষাই আমাদের নেয়া উচিত, স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিক সময়ে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। আর শিক্ষার্জন ফরজ।

আজব পাখি

কোন এক জায়গায় এক গাছে বসে একটা পাখি মনের সুখে গান করছিল। এমন সময় ঐ পথ দিয়ে 'বদরক' শহরের একজন লোক যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাখির গানে থেমে গেলেন। তিনি শুনতে পেলেন– পাখি বলছে, আজব শহর বদরক। অর্থাৎ বদরক শহরটি এক আশ্চর্য জায়গা। দীর্ঘদিনের প্রবাসী পথিক আপন শহরের গুণগান পাখির মুখে শুনে ঐ কথাগুলোই মনের অজান্তে দাঁড়িয়ে থেকে উচ্চারণ করছিলেন। ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে এক ফেরিওয়ালা যাচ্ছিলেন, তিনি এই বিদেশী পথিককে স্বগোক্তি করতে দেখে বললেন, কি হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে ? তখন পথিক ফেরিওয়ালাকে সব খুলে বললো। সব শুনে ফেরিওয়ালা পাখিটির কথা শুনার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, কই ? পাখিতো বলছে, 'পেয়াজ,লহছন, আদরক" অর্থাৎ পেয়াজ, রসুন ও আদা।

ফেরিওয়ালার বক্তব্যে পথিক ক্ষেপে যেয়ে শক্তভাবে প্রতিবাদ করলো। এভাবে দু'জনের ভেতর যখন হাতাহাতি শুরু হয়েছে, সে সময়ে একজন দরবেশের হস্তক্ষেপে তা থেমে গেল। দরবেশ দু'জনের গণ্ডগোলের

www.pathagar.com

কারণ জানতে চাইলেন। উভয়ে মূল ঘটনা খুলে বললেন। এবার দরবেশ পাখির দিকে তার কান খাড়া করলেন। কিছুক্ষণ পর হেসে বললেন.. তোমরা যা বলছ, পাখি তার কোনটাই বলছে না। পাখি বলছে, "আজব খোদাকি কুদরত" অর্থাৎ আশ্চর্য খোদার মহিমা। এরপর দরবেশ সেখান থেকে দ্রুত সরে গেলেন।

মুন্শী মেহেরুল্লাহ এ গল্পের মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন, যে য়ে প্রকৃতির মানুষ তার চিন্তা-ভাবনাও সেই রকমই হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোন জিনিস থেকে ভালোটা বেছে নেয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

খাল পার করা

দাদার সাথে নাতি গেছে এক জলসায় ওয়াজ শুনতে। মাওলানা সাহেব মাসলা-মাসায়েল থেকে শুরু করে আত্মিক উন্নতি, পারিবারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ওয়াজ শেষ হতে অনেক রাত হল।

ওয়াজ শেষে দাদা নাতি বাড়ির পথ ধরলো। নাতিটির মাওলানা সাহেবের ওয়াজ খুব ভাল লেগেছিল। এজন্য সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, মাওলানার প্রতিটি কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। পথে এক জায়গায় একটা ছোট খাল পার হতে হয়।

অবশ্য খালটি (নালাটি) তেমন গভীর ছিল না, হেঁটে পার হওয়া সম্ভব ছিল। দাদা অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি কোন ইতস্তত না করেই খালে নেমে পড়লেন এবং পার হলেন। কিন্তু গোল বাঁধলো নাতিকে নিয়ে, দাদা ওপারে গিয়ে দেখেন নাতিটি ঠায় দাঁড়িয়ে। তিনি রাগতস্বরে বললেন– কিরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? বাড়ি যেতে হবে তো, না কি ?

নাতিটি এবার কেঁদে ফেলে বললো, দাদা ! ছতর যে আলগা হয়ে যায়। মাওলানা সাহেব তো বললেন, ছতর আলগা হলে ফরজ তরকের গুণাহ হয়।

দাদা ততোধিক রাগতস্বরে বললেন, রাখ তোর গুণাহ। পথে-ঘাটে

www.pathagar.com

খাল পার হতে গেলে একটু-আধটু ছতর আলগা হয়েই থাকে।

নাতিও নাছোড়বান্দা। সে বললো, হুজুর তো খুব করে পালনের কথা বললেন, আর এগুলো পালন না করলে তো দোজখের আগুনে ঠিকই জ্বলতে হবে।

দাদার ধৈর্যের বাঁধ এবার গেল খান খান হয়ে গেল, তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, ওরে আমার ফুটো মৌলবীরে, সারা জীবন ওয়াজ শুনলাম এখনো খাল পার করতে পারলাম না। আর উনি কিনা এক দিনে খাল পার করতে চায়। আয় আয়! কাপড় তুলে পার হয়ে আয়।

কালুর মায়ের স্বামী ভক্তি

গ্রামের বউ "কালুর মা" ওয়াজ শুনতে গেছে। সবে এক ছেলের মা, তাই তাকে আদর করে কালুর মা বলে সবে ডাকে। কালুর মা-ও ছেলের বাপকে 'কালুর বাপ' বলে ডাকে।

স্বামীর নাম ধরে তো আর ডাকা যায় না। কালুর মা-ও তাই সাবধান হয়ে যায়।

কিন্তু ওয়াজ শুনে কালুর মা'র মন গেল বিগড়ে। মুন্শী সাহেব ওয়াজে বলেছেন, স্বামীর সেবা করা ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো কাজ নেই।

স্বামীর সেবা ? 'সেবা' জিনিসটি কি, কালুর মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

মুন্শী সাহেব বলেছেন, আল্লাহ নাকি বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া যদি আর কাউকে সিজদা করতে বলা হ'ত, তাহলে স্ত্রীকে বলা হ'ত স্বামীকে সিজদা করতে।" বাপরে বাপ। আল্লাহর সেবার পর স্বামী সেবা! আল্লাহর সেবা তো নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদি।

আর স্বামীর সেবা ?

কালুর মা মুশকিলে পড়ে যায়।

কালুর মা প্রতিজ্ঞা করেছে, স্বামীকে সেবার মত সেবা করবে। এত বড় মর্তবা যার, স্বয়ং খোদাতায়ালার পরে যার স্থান, তার সেবা কি আর

www.pathagar.com

সহজ! আজ ভোর থেকে কালুর মা নতুন করে স্বামীর সেবায় লেগেছে। ফজরের নামাজ শেষ করে কালুর মা তসবীহ তেলাওয়াত করে থাকে।

কালুর মা লেখাপড়া জানে না। তেলাওয়াতের মর্মও সে বোঝে না।

গ্রামের আখুঞ্জী সাহেব বলেছেন, নামাজের পর 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' বলে তসবীহ ঘোরালেই হবে। আল্লাহর নাম করলেই আল্লাহর সেবা হবে। কালুর মা'র মাথায় এক নতুন বুদ্ধি খেলে যায়। সে আজ কালুর বাপের নাম জপ করবে, আল্লাহর নাম জপের পরে।

কালুর মা নাম জপতে বসে যায়।

'কালুর বাপ', 'কালুর বাপ', 'কালুর বাপ'................ ।

কালুর মায়ের জপ আর থামে না।

এদিকে বেচারা কালুর বাপ লাঙল নিয়ে মাঠে যাবে। সকাল বেলার 'জাউ' (নাশতা) রাঁধা হয়নি। কালুর বাপ তাই তাগিদ দিচ্ছে। কালুর মা বিরক্ত হয়ে বলে "সকাল বেলায় চেঁচামেচি করো না দেখি, তোমার নাম জপটা শেষ করেনি।"

কালুর বাপের নাম জপ? সে আবার কি ?

কালুর বাপ এর মানে বোঝে না।

কালুর বাপ তেড়ে ওঠে, ওসব রাখো, আমার নাশতা কই ?

কালুর মা–ও তেড়ে ওঠে, – এখন থামো, তেলাওয়াতটা শেষ করনি।

দু-জনে বেঁধে যায় তুমুল ঝগড়া। এর মীমাংসা কি হবে? মুনশী সাহেবকে ডাকা হয়। তিনি দেবেন এর মসলা। কালুর মা স্বামীর ঘর-কন্নার কাজ বাদ দিয়ে কালুর বাপের নাম জপ করলে স্বামীর সেবা হবে কি না।"

এ গল্পের মাধ্যমে মুন্শী সাহেব বুঝাতে চেয়েছেন যে, না বুঝে এবাদত করলে অর্থাৎ মূর্খের এবাদত কোন কাজেই আসে না।

(মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ-৯০-৯১ পৃঃ)

www.pathagar.com

ভূতদের মিলাদ মাহ্ফিল

একবার ভূতেরা এ সিদ্ধান্তে পৌছালো যে, তারা এখন থেকে বিভিন্ন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে মুসলমানদের মত মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করবে। এরা একটা প্রকাণ্ড মাঠে বাস করতো। কিন্তু এদের মিলাদ মাহফিল পড়ানোর মত কোন মৌলবী বা মাওলানা ছিল না। এ জন্য তারা নিকটস্থ মুসলমান পাড়ার মৌলবী সাহেবকে দিয়ে তাদের মিলাদের কাজ সারবে এ মনস্থ করলো এবং কিছু ভূত মৌলবী সাহেবকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

স্বশরীরে ভূতদেরকে তার বাড়িতে হাজির হতে দেখে মৌলবী সাহেবের চক্ষু তো চড়ক গাছ। মুখ থেকে কথা ফোটে না এ অবস্থা। কোন রকম সাহস করে তাদের আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। সব কথা শুনে মৌলবী সাহেবের অবস্থা আরো কাহিল। বুঝি মৃত্যু পরওয়ানা তার সামনে। তবে মৌলবী সাহেব ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য, কল্যাণের জন্য মিলাদ মাহফিল করবে এত আনন্দের কথা। এতদিন পরে তোমাদের যে সুমতি হয়েছে এ জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শোকরিয়া। কিন্তু কথা হলো আমি কার দাওয়াতে যাব ?

সংগে সংগে সব ভূত একযোগে বলল– আমি ! আমি !

মৌলবী সাহেব স্মিত হেসে বললেন– দেখ বাবা সকল, মিলাদ মাহফিল বা ওয়াজ মাহফিল যাই কর না কেন তার একটা সিস্টেম তো আছে? একটা কমিটি থাকবে, তার সভাপতি, সেক্রেটারী থাকবে। অবশ্য তোমরা সবাই 'আম' ভাবে এ কমিটির সদস্য হতে পার। এখন কথা হল, তোমরা যদি মিলাদ মাহফিল করতে চাও তাহলে এখনই গিয়ে একটা কমিটি কর এবং কে আমাকে দাওয়াত দিতে আসবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও। এরপর তিনি এসে দাওয়াত দিলে আমি অবশ্যই মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হব।

www.pathagar.com

ভূতেরা ফিরে গিয়ে সমস্ত ভূতকে মাঠের একদিকে জড়ো করলো এবং মৌলবী সাহেবের সব কথা বলল। সব কথা শোনার পর সভায় হুলস্থুল পড়ে গেল, সবাই সভাপতি অথবা সেক্রেটারী হতে চায়। এমনকি কমিটির সদস্য পর্যন্ত কেউ হতে রাজী নয়। প্রথমে কথা কাটাকাটি, এরপর হাতাহাতি, কিল, চড়, লাথি, দুমাদুম শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল, রক্তের নদী বয়ে গেল, আশপাশের গাছ-গাছালিগুলোও রেহাই পেলো না। সব পড়লো মুখ থুবড়ে। ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বলা যায়। এলাকার ভূতের বংশ ঐ দিনই গেল ধ্বংস হয়ে।

মেহেরউল্লা সাহেব এ গল্পের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন, সবাই নেতা হতে চাওয়ার পরিণাম কত ভয়াবহ অর্থাৎ প্রকৃত নেতার অভাব হলে দেশের অবস্থা কি হতে পারে ?

বিভেদের কুফল

গল্পটি হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তার 'কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে মুন্‌সী সাহেবের বলা বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে গল্পটি হুবহু হবিবর রহমান সাহেবের ভাষায় উল্লেখ করছি, "একজন ব্রাহ্মণ, একজন নমঃশূদ্র এবং একজন মুসলমান এক মুসলমানের ইক্ষু ক্ষেতে গিয়া ইক্ষু চুরি করিয়া খাইতেছিল। হঠাৎ কৃষক ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, সে একাকী ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। অতএব ইহারা যাহাতে একতাবদ্ধ হইতে না পারে, তজ্জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। সে বলিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ হিন্দু জাতির দেবতা স্বরূপ, তিনি আমার ভূঁইয়ের একখানা ইক্ষু খাইয়াছেন, সে ত আমার সৌভাগ্য। মুসলমান আমার জাত ভাই, তিনি যদি আমার সামান্য ইক্ষু খাইয়া থাকেন, তাহাতেই বা আমার এমন কি ক্ষতি হইয়াছে? কিন্তু বেটা নমঃশূদ্র, ছোট লোক, তুই কেন আমার ইক্ষু খাইলি? এই বলিয়া সে নমঃশূদ্রকে প্রহার করিতে করিতে আধমরা করিয়া ফেলিল।

এতক্ষণ ব্রাহ্মণ ও মুসলমানটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা

www.pathagar.com

দেখিতেছিল। এখন ভূঁই অলা ব্রাহ্মণকে বলিল, বেটা চোর, ছুঁচো, তুই হিন্দুর বামন, আমার কি? ইনি আমার স্বজাতি, ইহাকে নয় ক্ষমা করিতে পারি। তোকে উচিত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িব না। এই বলিয়া সে ব্রাহ্মণকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে লাগিল। এতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানটি আনন্দে ও গৌরবে হাসিতেছিল।

এখন কৃষক ব্রাহ্মণকে আচ্ছা করিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া সহসা মুসলমানটির গলা ধরিয়া বলিল, বেটা বেঈমান, চোর-বদমাইশ। তুই মুসলমান হইয়া চুরি করিস? এই বলিয়া তাকে পিটাইতে পিটাইতে আধমরা করিয়া ফেলিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ কাহিনীর অধিকাংশই কবি হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর –'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' নামক শিশুতোষ কাব্যে মুন্‌সী মেহেরউল্লার বলা গল্প বলে উল্লেখ করেছেন।

সাহিত্যিক মেহেরউল্লা

আমাদের দেশে ইসলাম প্রচার হয়েছিল মূলত ব্যবসায়ী ও পীর, ওলি, দরবেশদের মাধ্যমে। আরব বংশজাত মুসলমান এদেশে খুব সামান্যই এসেছিলেন। আর সেই উপলক্ষ্যেই ভারত বর্ষে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সেটা কোনদিনই ইসলামের পুর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে প্রচারিত হতে পারেনি। ফলে বিধর্মীদের অনেক রকম রেওয়াজ আমাদের মধ্যে পুরোপুরি ভাবেই প্রচলিত থেকে গেছে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলমানরা এদেশ সাত'শ বছর শাসন করলেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রতিভাত হয়নি।

বাংলার স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যাওয়ার পর বহুবার বহু আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে হযরত সাইয়েদ আহম্মদ শহীদ রেরেলভী, শাহ দেহলবী, হযরত শাহ ইসমাইল, শহীদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শহীদ তীতুমীর প্রমুখ মুজাহিদগণ এ আন্দোলনের হোতা ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, আল্লাহর

www.pathagar.com

যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হোক। কিন্তু তা'না হলেও যুগে যুগে এ আন্দোলন মুসলমানদের মনে ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে, এরই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রসেনানী মুন্সী মেহেরউল্লার ভেতর।

তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করলেও সাহিত্যের জন্যে তিনি তা করেননি। তিনি করেছেন অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে তাদের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাদের ভেতর যে খোদাদ্রোহী শেরকী রসম রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা দূর করার জন্য। ধর্মের নামে যে সমস্ত অধর্ম ইসলামের ভেতর ঢুকে পড়েছিল, তা'দূর করার জন্য। সব চেয়ে বড় কথা, পাদ্রী ও হিন্দুদের অপপ্রচার থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্যই তিনি সাহিত্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তবুও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য অস্বীকার করার মত নয়।

তাঁর প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য

(১) খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬)

(২) মেহেরুল এসলাম বা এসলাম রবি (১৮৯০)

(৩) রদ্দে খ্রীস্টান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৭)

(৪) বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার (১৮৯৮)

(৫) হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮)

(৬) পান্দনামা (১৯০৮)

(৭) সাহেব মুসলমান (অনুবাদ, ১৯০৯)

(৮) খ্রীস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ (১৯০৮)

(৯) বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের এসলাম গ্রহণ

এবার বইগুলি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার চেষ্টা করবো-১৮৮৬ ঈসায়ী সালে 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা" বইটি প্রকাশিত হয়। মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার একটি ছোট বই এটি। এই বইতে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারকের তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। ত্রিতত্ত্ববাদের অলীকতা ও বাইবেলের অসারতা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইটির সাহিত্যিক মূল্য নেই বললেই চলে।

www.pathagar.com

মুন্‌সী সাহেবের দ্বিতীয় বইটি হলো মেহেরুল এসলাম, যেটি বহুল প্রচারিত। চৌত্রিশ বছর বয়সের মেহেরউল্লা এ গ্রন্থে হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মূল ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে দেখিয়েছেন।

এই গ্রন্থে মেহেরউল্লা ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–

"হিন্দুদিগের মধ্য হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র এসলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনা পূর্বক প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।"

গ্রন্থের অপর অংশে মুসলমানদের প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব নামাজ' রোজা, প্রভৃতি সমন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি বাউল ফকির ও কবি গানের গায়কদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

তাদের জানাজা পড়া উচিৎ নয় এমন মন্তব্যও করেছেন। তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন– 'হে গাইনগণ তোমরা নিজেও ডুবিলে পরকেও ডুবাইলে। তোমাদের নিজের গান মৃত্যুকালে কোন কাজে আসিবেনা।'

এই গ্রন্থে তিনি গায়ক ও সুদ গ্রহণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামান বলেছেন-

"এখানে দেখা যায় যে, মেহেরউল্লা ইসলামকে কেবল খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চাননি, প্রচলিত ধর্ম জীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সৈয়দ আহম্মদ বেরেলভির সংস্কারান্দোলন তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিলো এমন ধারণা করা স্বাভাবিক। সৈয়দ আহমদ পন্থীরা মুসলমানদের প্রচলিত জীবন ধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে যেমন শিক্ষা দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীলতা আধুনিক জীবন যাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করতে দেয়নি। অনুরূপভাবে মেহেরউল্লা যেমন আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের বিকাশকে প্রশ্রয় দেননি। তা'ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে উনিশ শতকে নৃত্য গীতের বিশুদ্ধ চর্চার চাইতে তার আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার চর্চাই আমাদের দেশে বিস্তার

www.pathagar.com

লাভ করেছিল।" (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৫০)

"বিধবা গঞ্জনা" মেহেরউল্লার একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মুনসী সাহেব হিন্দু বিধবাদের পূণর্বিবাহের জন্য সুপারিশ করেছেন। তিনি বিধবা জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে তুলে ধরেছেন। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন বিধবা বিবাহের অনুমোদনের জন্য। এই কথা থেকে আমরা অম্লান বদনে বলতে পারি যে, তিনি শুধু নিজের ধর্মেরই সংস্কার সাধন করতে চাননি তিনি অন্যান্য ধর্মের কুসংস্কারও দূর করতে চেষ্টা করেছেন। মেহেরউল্লা নিজেই লিখেছেন, "আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষোদোক্তি সমূহ যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, সরল সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়োগ পাইলাম। এমন কি স্থান বিশেষে সাধারণ মেয়েলী ভাষা ব্যবহার করিতেও লজ্জা বোধ করি নাই।"

এ গ্রন্থে তিনি সুললিত গদ্য ও স্থানে স্থানে পদ্য ছন্দে বিধবা জীবনের করুণ চিত্র উৎঘাটিত করেছেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের 'মৃনালীনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজ সিংহ' ও 'কবিতা পুস্তক', ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতাপসিংহ' যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদিত 'রাজস্থান' দীন বন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ইত্যাদি ইসলাম বিদ্বেষী গ্রন্থের প্রতিবাদে মুনসী মেহেরউল্লা তাঁর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' বইটি লেখেন। বইটিতে কিছু অশ্লীল দিক (যা হিন্দুদের ভেতরে প্রচলিত) থাকার কারণে সরকার কর্তৃক এর প্রচার নিষিদ্ধ হয়। আসলে তিনি মহাভারত, পদ্ম পুরাণ ও ব্রহ্ম কৈবর্ত পুরাণ থেকে হিন্দু দেবদেবীদের রঙ্গরস সম্বন্ধে নীতিহীনতার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যে সমাজ চন্দ্র সূর্য ও ধর্ম এবং কুন্তী গঙ্গা ও তুলসীর মতো দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা আর যাইহোক নীতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একেবারে ডাষ্টবিনে অবস্থান করছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উক্ত গ্রন্থখানি তৎকালিন হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সমালোচিত হয়। পত্র পত্রিকায় মেহেরউল্লাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। পুস্তকের

www.pathagar.com

(৬ষ্ঠ সংস্করণে) উপক্রমনিকাতে মেহেরউল্লা এই আক্রমণের জবাব দিয়েছেন. 'হিন্দুদের উচ্চ হইতে নিম্ন শ্রেণীর গ্রন্থ লেখকগণ শতাধিক বৎসর পর্যন্ত পবিত্র এসলাম ধর্ম ও সমাজকে যত প্রকার কলুষিত চিত্রে চিত্রিত ও পৈশাচিক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া আসিতেছেন, কে তাহার ইয়াত্তা করিতে সক্ষম হইবেন। তাহারা সম্পূর্ণ অন্যায় বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া অকারণে মুসলমানদিগকে যবন, ম্লেচ্ছ, পাষন্ড, পাতকী, পাপিষ্ট, পাপাত্মা, দুর্দান্ত, দুরালয়, নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, এড়ে, অজ্ঞান এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি অসংখ্য কদর্য আখ্যায় আখ্যায়িত পূর্বক অসীম আনন্দ ভোগ ও আত্মযোগ সমাধা করিয়া থাকেন; কিন্তু কৈ কোন মুসলমান কবে তাহাদের তাদৃশ ভোগের বাধা জন্মাইয়া চরকরীর ন্যায় ফর ফর করিয়াছেন? ..... ন্যায়ের সাক্ষাৎ মূর্তি মাতা ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে বাস করিয়া, ঈদৃশ মিথ্যা ও অন্যায়বাদিগণকে কোনও ন্যায় বিচারে পতিত হন নাই ইহাই আক্ষেপের বিষয়।' (মুস্তফা নুরুল ইসলাম কর্তৃক উদ্ধৃত মুন্সী মহম্মদ মেহেরুল্লাহ পৃ-১৮)

উক্ত পুস্তকের ষষ্ট সংস্করণের উপক্রমাণিকাতে লেখক বলেছেন, 'জগতে হিন্দুর ন্যায় কল্পনা প্রিয় জাতি অতি বিরল, তাহারা সত্য সনাতন অনাদি অনন্ত পবিত্রময় খোদা তায়ালাকে বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ অসার ও কাল্পনিক দেব-দেবীর, মাঠ-ঘাট, প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু-পক্ষী এবং শিব লিঙ্গ ইত্যাদির পূজা উপাসনা করিয়া দুর্লভ মানব জীবনটির অপব্যয় করিতেছেন। আমরা তাহাদিগেরই জানিত, মানত ধর্ম গ্রন্থ সকল হইতে দেব ও দেবী কাহিনী এবং বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করতঃ; প্রকাশ করিলাম। যদি ইহা দ্বারা একটি মাত্র জড় বা নর পূজাকর মনও সেই সত্যময় খোদাতায়ালার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও আমাদের প্রমত্ত জীবন সার্থক হইবে।'

আসলে কি জান? বাগ্মী কুলতীলক ইসলাম প্রচারক মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল-

কর কর কর সবে সত্য ধর্ম অন্বেষন
অসার অলীক ধর্ম দাও দাও বিসর্জন।

'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেব লীলা' বইটি সপ্তম সংস্করণ বের হলে

www.pathagar.com

হিন্দুদের গায়ে জ্বালা চড়ে যায়। তারা এই বইটি ও 'বিধবা গঞ্জনা' বইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এবং প্রকাশককে শাস্তি প্রদান করার জন্য মোকাদ্দমা দায়ের করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে ঐ সময় যশোর কোর্টে কোন মুসলমান উকিল ছিলেন না। বইটিতে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হয়- আবু আল মুনসুর এম এম ইউ (মুন্সী মেহেরুল্লাহ)। বিচারক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমন্ত কুমার দাস গুপ্তের অধীনে মুন্সী মেহেরউল্লার জেষ্ঠ পুত্র মনসুর আহমদ তাঁর পক্ষে উকিল নিযুক্ত করেন বাবু কেশব লাল রায় চৌধুরীকে। সরকারের পক্ষে উকিল ছিলেন রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার। ২৪শে মে ১৯০৯ সাল বিচারের রায় বের হয়। রায়ে মনসুর আহমেদের দু'শ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের জেলের আদেশ হয়। তিনি জজ কোর্টে আপীল করেন। আপীল বাতিল হয় ২৮শে জুলাই ১৯০৯ সালে। বিচারক রায় বহাল তো রাখেনই উপরন্তু এরূপ মন্তব্য করতেও কুণ্ঠিত হলেন না যে, তাঁর আরো কঠোর সাজা হওয়া উচিৎ ছিলো। অতএব বই দু'খানি বাজেয়াপ্ত হয়। বন্ধুগণ বুঝতেই পারছো মুসলমানদের দুর্দশার কথা। জজ সাহেবের রায়ের হুবুহু বাঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো-

আপীল গ্রহণকারী আদালত কর্তৃক রায়ের শুনানী দায়রা আদালত আপীলের আওতাধীন। ২৮শে জুলাই ১৯০৯ সাল।

যশোর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু শ্রীমন্ত কুমার দাস গুপ্তের ২৪শে মে ১৯০৯ সালের আদেশের উপর আপীলের প্রার্থনা। মনসুর আহমেদ আপীলকারী দণ্ডাদেশ টাকা ২০০ (দুইশত টাকা) জরিমানা অনাদায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারানুসারে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ফৌজদারী কার্য বিধির ৫২১ ধারানুসারে আসামীর দখলে রক্ষিত "বিধবা গঞ্জনা" এবং "হিন্দু ধর্ম রহস্য" পুস্তকের কপিগুলি ধ্বংস করার আদেশ।

বাবু কেশব লাল চৌধুরী আপীলকারীর পক্ষে উকিল। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, সরকারী পক্ষের উকিল। বিচারের রায়-

আপীলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারানুসারে "হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেব লীলা" এবং "বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার" নামক দু'খানি বই এর জন্য বিচার করা হয়েছে এবং দু'শ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আপীলকারীর পক্ষের উকিল ঐ পুস্তকদ্বয় অশ্লীল কিনা তা আমাকে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই অনুরোধে অবশ্য আমি বিস্মিত হয়েছি। যে কোন ব্যক্তি বই দু'খানি পড়া মাত্রই বুঝতে পারে যে, কি জঘন্য ভাবে অশ্লীল ঐ বই দুখানি বিশেষ করে 'বিধবা গঞ্জনা' নামক বই খানি। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, "হিন্দু ধর্ম রহস্য" নামক বই খানি ধর্মীয় বির্তকের বই এবং তাতে কেবল মাত্র হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ্য আছে তাহাই উদ্বৃত করা হইয়াছে। একমাত্র ভূমিকা থেকেই বোঝা যায় যে, বইখানি ধর্মীয় বির্তকের বই নয় বরং প্রতীয়মান হয় যে, কিছু হিন্দু লেখক মুসলমানদেরকে অপমানিত করেছেন মনে করে নিয়ে লেখকের হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রবল ছিল। সে যা হোক, যে বইতে ভিন্ন ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ থেকে কতকগুলো অশ্লীল অংশ সংকলন করে ধর্মীয় বিরোধ প্রমাণ করা হয়েছে তা স্পষ্টতঃ একটি অশ্লীল প্রকাশনা। 'বিধবা গঞ্জনা' নামক অপর বইখানি সম্বন্ধে বলতে হয় যে, এই বইখানিতে যে সমস্ত সাংঘাতিক রকমের অশ্লীলতা দেখা যায়, তাঁর সাথে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ বিধবাদের পূন: বিবাহের বাঞ্ছনীয়তার সামান্যতম বা কোন সংযোগ নেই।

নিম্ন কোর্টের সুযোগ্য বিচারকের বিচারে সমস্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে আলোচিত হয়েছে এবং তাতে আমার আর কিছু যোগ করার নেই।

আসামীর কাছে যে ঐ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের জন্য আছে তা স্বীকৃত সত্য। তবুও যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, আসামী বয়সে তরুণ এবং সে তার পিতার লিখিত এবং বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত পুস্তক বিক্রয় করছিল মাত্র। কিন্তু আমি দেখছি দু'খানি পুস্তকের মধ্যে একখানি মাত্র তার পিতার লিখিত এবং আসামী উভয় পুস্তকই প্রকাশ করেছে (উভয় পুস্তকের প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, আসামীকে কোন রূপ শাস্তি না দিয়ে বরং লঘু শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

আপীলের আবেদন প্রত্যাখান করা হলো।

তারিখ- ২৮/৭/০৯ ঈসায়ী

স্বাঃ/এল পালিত
দায়রা জজ।

www.pathagar.com

(মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ– শাহাদাত আলী আনসারী পৃঃ স-২৩)

বন্ধুরা বুঝতেই পারছো মুসলমানদের অবস্থা সে সময় কেমন নাজুক ছিল।

মুন্‌সী মেহেরউল্লার 'পান্দনামা' বইটি হলো বিশ্ববিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সা'দীর ফারসী কাব্যগ্রন্থ 'পান্দনামা'র বঙ্গানুবাদ। এই বইটিতে ফারসী ও বাংলা অক্ষরের মূল কাব্যের সঙ্গে পদ্যের অনুবাদ আছে। এটি ১৯০৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃতিতে লিখিত একেশ্বরবাদ সম্পর্কে "শ্লোকমালা" গ্রন্থটি শ্লোক সমূহের সংলকন। ১৯১০ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। "খ্রীস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ" মুন্‌সীজির অন্য একটি গ্রন্থ। পাদ্রীদের প্রচারের বিরুদ্ধে এই বই এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি তর্ক করতে পারতেন প্রচন্ড বিক্রমে। তিনি কখনো যুক্তি তর্কে হেরেছেন এমন নজীর আমাদের জানা নেই।

"রদ্দে খ্রীস্টান ও দলিলোল এসলাম" তাঁর অপর একটি গ্রন্থ কিন্তু এই বইটি পুরোপুরি তিনি জীবিত অবস্থায় ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়।

"বাবু ঈশান চন্দ্র মণ্ডল এবং চালর্স ফ্রেঞ্চের এসলাম গ্রহণ" তার লিখিত আরও একখানি গ্রন্থ। তাছাড়া 'আসল বাঙালা গজল' নামক একটি বাংলা গজলের বই ১৯০৮ সালে মুনশী মুহম্মদ জমির উদ্দীন প্রকাশ করেন। এতে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা লিখিত দু'টি গজল ছিল।

এই ছিল আজকের আলোচ্য সৈনিক মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লার সাহিত্য কর্ম।

সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা

মুনশী মেহেরউল্লা তাঁর প্রতিভাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম সমাজ সেবক। তাইতো নিজে

www.pathagar.com

সাহিত্য অনুরাগী ও সাহিত্য সেবক হওয়ার সাথে সাথে আরও তরুণ সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যে সময়কার কথা বলছি মুসলমানরা সে সময় প্রচন্ড অবজ্ঞার পাত্র ছিল। মুসলমানদের ভেতর সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া একটা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার ছিল। ঠিক সেই সময়ই বাংলার অদ্বিতীয় বক্তা মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা এগিয়ে এলেন। যখন মুসলমানদের মধ্যে কবি সাহিত্যিক একদম বিরল ছিল সেই সময় তাঁরই উৎসাহ উদ্দীপনায় মৌলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করীম, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহিত্য ক্ষেত্রে আগমন করলেন। তার ফলশ্রুতিতে পেলাম দৈনিক আজাদের মত পত্রিকা, মোস্তফা চরিত, অনল প্রবাহ, পরিত্রাণ-এর মত গ্রন্থ। আজাদ এখনো জাতীয় জীবনে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। জানা যায়, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর "অনল প্রবাহ" ও ফজলল করীমের 'পরিত্রাণ' এবং শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত গ্রন্থ তিনটি তাঁরই খরচে প্রকাশিত হয়।

বুঝতেই পারছো, তরুণ সাহিত্যিকদের তিনি কিভাবে উৎসাহিত করতেন।

তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করে গেছেন নির্যাতিত নিষ্পেষিত মুসলমানদের জন্য। তিনি যা করে গেছেন আজকের সমাজ তাঁর সে কাজের স্বীকৃতি দিচ্ছে। সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে সাহিত্যিকের মর্যাদা দিচ্ছে। আসলে, তিনি নিজেই তাঁর অধিকার আদায় করে নিয়েছেন।

সংগঠক মেহেরউল্লা

মুন্সী সাহেব একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে পুনরায় তাদের স্বমহিমায় ফিরয়ে আনতে হলে বিভিন্ন সংগঠন,

www.pathagar.com

সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যে অপরিহার্য তা তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে ঠিকই ঢুকেছিল। তিনি বুঝেছিলেন সভা-সমাবেশের বক্তৃতা ও পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের পাশাপাশি সংগঠন, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। আর তা'হলেই তাঁর এ সংস্কার আন্দোলন ও ইসলাম প্রচারের কাজ সঠিক অর্থে হালে পানি পাবে।

এসলাম ধর্মোত্তেজিকা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতা থেকে শেখ আবদুর রহিম, মৌলভী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, মুন্‌সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ মনীষীগণ যোগদান করেন।

নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি

ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতা নাখোদা মসজিদে মুন্‌সী মেহেরউল্লা, খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার, মোহাম্মদ জাকারিয়া, খান বাহাদুর নূর মোহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এক সভায় মিলিত হন এবং 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এ অধিবেশনেই মুন্‌সী মেহেরউল্লার ওপর বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তা সুষ্ঠুভাবে পালনও করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি

১৮৯৯ সনে 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স'-এর ১৩তম অধিবেশনে 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ব্যাপারে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন, 'বর্তমান শতকের প্রারম্ভে 'বঙ্গীয়

মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ছিল মুসলমানদের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। বলা যেতে পারে এই প্রতিষ্ঠানটি তখন বাংলার মুসলমানদের প্রধান মুখপাত্র স্বরূপ ছিল। মুন্সী মেহেরউল্লা শিক্ষা সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সমিতির আন্দোলনে এবং বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এবং ১৩১২ সালে কুমিল্লার পশ্চিম গাঁয়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তিনি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর পরের বৎসর ১৩১৩ সালে ঢাকায় 'নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতি'র যে ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে, মেহেরউল্লা সে অনুষ্ঠানেও সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন।' উল্লেখ্য যে এই সম্মেলনের শেষেই 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র জন্ম হয়। সারা ভারতের হিন্দুরা বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আন্দোলন চালাচ্ছিল। মুন্সী মেহেরউল্লা সর্বশক্তি দিয়ে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন বলে জানা যায়।

আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম

১৮৯৯ সনে ডাক্তার মাহতাব উদ্দীন-সাহেব যশোর মনোহরপুরে 'শুভকরী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। 'শুভকরী' জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ঐ সনেই যশোরের ডিস্ট্রিক্ট সেসান জজ সৈয়দ নূরুল হুদার নামে 'শুভকরী' নাম পরিবর্তন করে সমিতির নাম রাখা হয় 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম'। এ সমিতির সাথে মুন্সী মেহেরউল্লা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

মাদরাসায়ে কারামতিয়া

আজকের যশোর ক্যান্টনমেন্টের মতিউর রহমান ঘাটি এলাকাটা ছিল তখনকার মনোহরপুর গ্রাম। এই গ্রামেই ১৩০৭ সনে মুন্সী মেহেরউল্লা পীর মাওলানা কারামত আলীর নাম অনুসারে 'মাদরাসায়ে

www.pathagar.com

কারামতিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা করা জরুরী ভেবে পরবর্তীতে এ মাদরাসার সাথে মধ্য ইংরেজী স্কুল চালু করেন।

তিনি একজন সংগ্রামী সংস্কারক হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন রাজনীতির সাথে একমত হতে পারেননি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু হলে তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি কংগ্রেসী আন্দোলনের সাথে কখনো একমত হননি। এমন কি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করানোর জন্য হিন্দু নেতারা অন্যায় পথে পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারক' লিখেছে, 'বিকৃত স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে হিন্দু নেতাগণ তাঁহাকে সহস্র সহস্র টাকার প্রলোভন দেখাইয়াও স্বদলভুক্ত করিতে পারেন নাই।'

স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের জন্য মুন্‌সী মেহেরউল্লাকে আহ্বান জানালে তিনি মন্তব্য করেন, 'একখানি ভগ্ন ও একখানি সচল পদ লইয়া পথ চলা যেমন দুষ্কর সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষায় যতদিন মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ হইতে না পারিবে ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুকরণ করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। অবশ্য ১৯০৬ সালে যখন ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা হয় তখন সে সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এ কথা আগেই বলেছি।

পরপারের পথে মেহেরউল্লা

তদানীন্তন বাংলার সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়াতেন তিনি। তাঁর তেজস্বী বক্তৃতা সহজেই মানুষের মনে স্থান করে নিতো। তারা মুগ্ধ হতো। অনুপ্রাণিত হতো। প্রভাবান্বিত হতো। ফলে, শত শত বিধর্মী অসাড় অলীক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতো।

অতিরিক্ত ছুটোছুটি তাঁর সইলো না। কর্মব্যস্ততা তাঁকে এত ক্লান্তির সম্মুখীন করলো যে, শেষ পর্যন্ত শরীর ভেঙ্গে পড়লো। সাংঘাতিকভাবে

www.pathagar.com

অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। উত্তর বঙ্গের তিনটি সভায় একদিনে বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। রংপুর থেকে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু জ্বর তখন নিউমোনিয়ায় রূপ নিয়েছে। সুরেন বাবু নামে যশোর শহরের এক হিন্দু ডাক্তার তার চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু জ্বর কমলো না। বরং দিন দিন বাড়তে থাকল। মুন্সী জমিরুদ্দীন প্রিয় বন্ধুর রোগ মুক্তির জন্যে কলকাতা ছুটলেন। একজন ভাল ডাক্তার আনার প্রয়োজন। কিন্তু সবশেষ হয়ে গেল। ১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৯০৭ ঈসায়ী সালের শুক্রবার মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

মুন্সী মেহেরউল্লা অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। রেখে গেলেন বৃদ্ধা মাতা, দুই স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন কন্যা ও বাংলার অসংখ্য গুণগ্রাহী। বাংলার আকাশে বাতাসে সেদিন রোনাজারি উঠেছিল। ঝরেছিল কত পাতা সে দুঃখে।

তার মৃত্যুর মাত্র চার বছর পর তার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন। মুন্সীজীর মৃত্যুতে বাংলার মুসলমান যে, কি শোকাভিভুত হয়েছিল তা তাঁর দু'জন কবি শিষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরলে সহজেই অনুমান করা যাবে।

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার মৃত্যুতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তার 'শোকোচ্ছাস' কবিতায় লিখেছিলেন-

যাঁর সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্ব অন্ধকার"

শেখ ফজলল করীম 'সোলতান' পত্রিকায় লিখেছিলেন–

"তোমারি বিপুল স্নেহ আকুল আহবানে
হতভাগ্য ঐই কবি লভি নব বল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে
আজ তুমি দেখিছ না হায় তার বুকে
কি ভীষণ চিতানল জ্বলে ধিকি ধিকি।"

সোনা বন্ধুরা, তোমরাই বলো, মুন্সী মোহম্মদ মেহেরউল্লার যারা

www.pathagar.com

ভক্ত এবং কবি, তারা না হয় কবিতার ভাষায় তাদের মনের আকুতি প্রকাশ করলেন কিন্তু বাংলার অগণিত মুসলমান! তারা তো চোখের পানি নিরবেই ফেলে তাদের বুকটা হালকা করতে চাইল। তোমরা যদি মুসলিম রেনেসার এই অগ্রসেনানীর পিতৃভূমি ছাতিয়ানতলা গ্রামে যাও, তা হলে দেখতে পাবে– তার কবর সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে লেখা আছে শোক গাঁথা এক পংক্তিমালা–

"ভেঙ্গেছিল নিঁদ ঘুমন্ত জাতির যাহার প্রচার বাগ্মীতায়
কর্মবীর সেই আল্লার মেহের চির বিশ্রাম লভিছে হেথায়
নায়েবে নবী দ্বীনের হাদী বাগ্মী কুল তিলক
ইসলাম প্রচারক, স্বদেশ প্রেমিক, সমাজ সেবক।"
মরহুম মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ।
জন্ম-১০ই পৌষ, ১২৬৮
ওফাৎ-২৪শে জ্যেষ্ঠ ১৩১৪

মেহেরউল্লার কাজের স্বীকৃতি

বঙ্গ বিখ্যাত বাগ্মী মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা যে সময় মুসলমান জাতিকে খ্রীস্টান পাদ্রী ও হিন্দুদের রোষানল থেকে রক্ষা করেছেন, সেই সময় মুসলমান জাতির অধঃপতন ও দুর্দশার কথা স্মরণ করলেও শরীর শিউরে উঠে। যতদূর ধারণা এই সময় যদি আল্লাহর মেহেরবানীতে মেহেরউল্লার আর্বিভাব না হতো মুসলমানদের ইতিহাস ভারত উপমহাদেশে হয়ত বা অন্য রকম হত। হয়ত ৮৬ জন মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশ আজ খ্রীস্টান অধ্যুষিত বাংলাদেশে পরিণত হত।

আল্লাহ মেহেরবান। আমাদেরকে এমন নাজুক অবস্থ্যা থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু যার প্রচার বাগ্মীতায় রক্ষা পেল এদেশের মুসলিম সমাজ তারা তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য কতটুকু করেছে সেটাই এখন আলোচনা করতে চাই- তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য যা কিছু করা হয়েছে তার

www.pathagar.com

মধ্যে যশোর কুষ্টিয়া ট্রেন লাইনের একটা ষ্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে 'মেহেরুল্লাহনগর'। এ ষ্টেশনটি তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছাতিয়ানতলা সংলগ্ন। দ্বিতীয়ত যশোর শহর থেকে ৭ মাইল দূরে ১৯৭৭ ঈসায়ী সালে ঝাউদিয়া বাজারে কর্মবীর মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ একাডেমী নামে একটি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তদানিন্তন জেলা প্রশাসক জনাব মহিউদ্দীন খান আলমগীর।

১৯৭৮ সালে মুন্সী মেহেরউল্লার ১১৬তম জন্ম বার্ষিক উপলক্ষে যশোরের রবিবাসরীয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি ঝাউদিয়াস্থ মুন্সী মেহেরুল্লাহ একাডেমিতে বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁর জীবনীর ওপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ উপলক্ষে রবিবাসরীয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি একটা স্মরনিকা প্রকাশ করে। যতদূর জানা যায় তাঁর ওপর এটাই প্রথম স্মরণিকা। অবশ্য এ ব্যাপারে তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মহিউদ্দীন খান আলমগীর এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) জনাব আজিজুল হক পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

এ স্মরণিকায় জেলা প্রশাসক লিখেছিলেন "তাঁর (মেহেরউল্লার) শক্তিশালী লেখনী ও সমাজ সংস্কারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তৎকালীন সমাজকে এক নব দিগন্তের সন্ধান দিতে সমর্থ হয়। তাঁর ১১৬তম জন্ম বার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।"

কুষ্টিয়ার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব তাজুল হক লিখেছিলেন– "তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিড়েছি, সংগ্রাম করে চলছি, জাতির অজ্ঞতা ও কুসংস্কার অন্ধকারকে বিদূরিত করতে।"

যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিখেছেন, "...... তিনি যদি বাংলার মুসলমান সমাজকে অনাচার কদাচার ও অত্যাচারের হাত হতে উদ্ধার করে ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তির দিকে আকৃষ্ট না করতেন তবে হয়ত তৎকালীন বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিভ্রান্তির শিকার হতেন। তাই তাঁর প্রতি প্রতিটি মুসলমান তথা বাংলার মুসলমান সমাজ চির কৃতজ্ঞ থাকবে।" স্মরণিকায় তাঁর জীবনের ওপর বেশ কিছু লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে যশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক একবার তার সমাধিস্থল ছাতিয়ানতলাতে আর একবার ঝাউদিয়াস্থ মেহেরুল্লাহ একাডেমীতে কিছু সংখ্যক কবি সাহিত্যিক নিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। যশোর টাউন হল ময়দানকে "মেহেরুল্লাহ ময়দান" নামকরণ করা হয়েছে।

এরপর ১৯৭০ সালে যশোর সিটি কলেজের কতিপয় মেহের ভক্ত ছাত্রের উদ্যোগে সিটি কলেজের নামকরণ "মুনশী মেহেরুল্লাহ কলেজ" করা হয়। এমন কি মুন্‌সী মেহেরউল্লার নাম লিখিত প্রস্তর ফলকও স্থাপন করা হয়। কিন্তু সে নামকরণ পরে অজ্ঞাত কারণে বাতিল করা হয়। এরপর "মুনশী মেহেরুল্লাহ একাডেমী" নামে ১৯৮৩ সালে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ও বন্ধু মুন্‌সী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মেহের চরিত' (১৯০৯) প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই জলপাইগুড়ি থেকে মোহাম্মদ আছিরদ্দীন প্রধান রচিত 'মেহেরউল্লার জীবনী' (১৯০৯) প্রকাশিত হয়। এর অনেকদিন পর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থটি।

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লার জীবন ও কর্মকে নিয়ে এ তিনটি নির্ভরযোগ্য বই প্রকাশিত হওয়ার পর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৬৭ সনের শীত সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকা'য় 'মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন' শিরোনামে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একটি নাতিদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয় মুস্তাফা নূরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। ১৯৮৩ সালে যশোর শহর থেকে মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী রচিত 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' প্রকাশিত হয়। এরপর মুনসী মেহেরউল্লার ওপর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব। তাঁর রচিত 'মুনশী মেহেরুল্লাহ : দেশ কাল সমাজ' গবেষণা গ্রন্থটি ১৯৮৩ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন্

www.pathagar.com

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অবশ্য আবুল হাসনাত রচিত 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' ও জোবেদ আলী রচিত 'ছোটদের মুনশী মেহেরুল্লাহ' নামে দুটো পুস্তিকাও প্রকাশ করেছে। এরও অনেক আগে ১৯৬৫ সনে শিশুদের জন্য দেওয়ান আবদুল হামিদ 'ছোটদের মুনশী মেহেরুল্লাহ' বইটি রচনা ও প্রকাশ করেন। পরে ১৯৮৫ সনে যশোর শহর থেকে মুহম্মদ জিলহজ আলী রচিত 'ছোটদের সৈনিক মেহেরুল্লাহ' প্রকাশিত হয়।

খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'প্রেক্ষণ' মুনশী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৯৬) প্রকাশ করেছে। নাসির হেলাল সম্পাদিত 'পালকি'র প্রথম সংখ্যায় মুন্সী সাহেবের অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি 'মানব জীবনের কর্তব্য' ও দ্বিতীয় সংখ্যায় শেখ জমিরুদ্দীন রচিত মুনসী মেহেরউল্লার সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয়েছে।

১৩০৬ সালে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত ও শেখ আজিজুদ্দীন প্রকাশিত 'হযরত ইসা কে?' পুস্তিকাটি মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছে– "স্বজাতি বৎসল, স্বধর্ম পরায়ণ, সুবক্তা, উন্নতমনা, বিবিধ সদগুণরত্ন বিমন্ডিত সোদর প্রতিম পরম সুহৃদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব করকমলেষু।"

১৯৯৬ সালে কবি আফজাল চৌধুরী অনূদিত ও বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্নাবাসের বাইবেল' গ্রন্থটি মুন্সী মেহেরউল্লার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

(১৮৬১-১৯০৭)

১৮৬৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার বারবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে মামার বাড়ীতে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্‌শী ওয়ারেশ উদ্দীন। স্থায়ী নিবাস যশোর শহর থেকে ৪ মাইল পশ্চিম-উত্তর কোণে ছাতিয়ানতলা গ্রামে।

১৮৬৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিদ্যাসাগর রচিত "বর্ণ পরিচয়" ১ম ও ২য় ভাগ সমাপ্ত এবং তৃতীয় পাঠ্যপুস্তক 'বোধোদয়' পাঠ শুরু করেন। কিন্তু স্নেহময় পিতা ওয়ারেস উদ্দীনের আকস্মিক ইন্তেকালের কারণে তাঁর লেখাপড়ার আপাতত ইতি ঘটে। পরে অবশ্য মহিয়সী মাতার নিকট তার পাঠ গ্রহণ অব্যাহত থাকে এবং তিনি এ সময়ে পবিত্র কোরআন, শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ ও পান্দেনামা পাঠ শেষ করেন। আরো পরে ১৮৭৫ সালে ১৪ বছর বয়সে তিনি খাজুরার নিকটবর্তী করচিয়া ও কয়ালখালী গ্রামে মুহাম্মদ ইসমাইলের নিকট ৩ বছর ও মুন্‌শী মেসবাহ উদ্দীনের নিকট ৩ বছর আরবী ফারসী উত্তরমরূপে অধ্যয়ন করেন।

২০ বছর বয়সে ১৮৮১ সালে তিনি যশোর জেলা পরিষদে ছোট একটি চাকুরী গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে পরবর্তীতে চাকুরী ত্যাগ করে দর্জির কাজ শুরু করেন। ঐ ১৮৮১ সালে অথবা ১৮৮২ সালে তিনি যশোর দড়াটানায় একটি দর্জির দোকান দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। যতদূর জানা যায়, এ সময় থেকেই খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার ময়দানী জবাব দেওয়া শুরু করেন। অবশ্য দর্জির কাজে কর্মরত অবস্থায় তিনি কিছুদিন দার্জিলিং ছিলেন। সেখানেও একটি দর্জির দোকান খুলেছিলেন তৎকালীন যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায়। এখানে থাকা অবস্থায় তিনি বাইবেল,

www.pathagar.com

বেদ, গীতা, উপনিষদ, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ গভীরভাবে পড়ার সুযোগ পান। বিশেষ করে এ সময় 'তোফাজ্জল মুকতাদী' নামক একটি উর্দুগ্রন্থ, হযরত সোলায়মান ওয়ার্সীর লেখা 'কেন আমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম', 'প্রকৃত সত্য কোথায়' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

১৮৮৬ সালে ২৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'খৃষ্ট ধর্মের অসারতা'। একই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইসলাম ধর্মোত্তোজিকা সমিতি যশোর'। মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা এ সময়ে আর দর্জি থাকলেন না, তিনি হয়ে উঠলেন রীতিমত একজন তর্কযোদ্ধা ও লিখিয়ে।

৩০ বছর বয়সে ১৮৯১ সাল, মোতাবেক ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২১, ২২ ও ২৩শে আশ্বিন তারিখে বরিশালের পিরোজপুরে মুসলমান-খৃস্টান তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বিপক্ষে ছিলেন পাদরী ঈশানচন্দ্র মন্ডল, পাদরী স্পার্জন ও পাদরী হাসান আলী। এ তর্কযুদ্ধে মুন্‌সী সাহেব জয়লাভ করেন।

১৮৯২ সালের ৩১ বছর বয়সে রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠক রত্নের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। জমিরুদ্দীন সাহেবের প্রবন্ধ ছিল 'আসল কোরআন কোথায় ?' উত্তরে মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ লেখেন, 'সর্বত্রই আসল কোরআন'। দীর্ঘ কলম যুদ্ধের পর জন জমিরুদ্দীন পরাস্ত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩৪ বছর বয়সে ১৮৯৫ সালে তাঁর 'মেহেরুল এছলাম' কাব্য এবং 'রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এছলাম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভান্ডার' কাব্যগ্রন্থটি। প্রশ্নোত্তর মূলক পুস্তিকা 'জওয়াবুন্নাছারা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা ৩৮ বছয় বয়সে পাবনা জেলার বড়ইবাড়ি হাটের জলসায় গিয়ে কিশোর ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাথে প্রথম পরিচিত হন। সময়টা ছিল ১৮৯৯ সাল। ঐ একই সালে তিনি খুলনার পায়গ্রাম কসবা, দৌলতপুর হাইস্কুল ময়দান, নোয়াখালীর ঈদগাহ ময়দান, জুবিলী

www.pathagar.com

স্কুল ময়দানের (৩, ৪ ও ৫ই ফাল্গুন ১৩০৬) জলসায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এ সব জলসায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার লোকের সমাগম হত।

'হিন্দু ধর্ম রহস্য দেবলীলা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় মেহেরুল্লাহর ৩৯ বছর বয়সে। এই ১৯০০ সালেই তিনি নিজ খরচায় শিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে তিনি যশোরের মনোহরপুর গ্রামে 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসাটিই বর্তমানে 'মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ একাডেমী' নামে পরিচিত। ঐ ১৯০১ সালেই তিনি বগুড়া টমসন হলে (২২শে মাঘ) ও পাবনা টাউন হলে (৪ ও ৫ই আষাঢ়) বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯০৩ মোতাবেক ১৩১০ বঙ্গাব্দের ২০ ও ২১ শে চৈত্র তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের ১ম অধিবেশনে যোগদান করেন। পরের বছর ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ় বিহারের টাউন হলের এক জলসায় বক্তৃতা দেন; যার জন্যে রচনা করেন 'মানব জীবনের কর্তব্য' (অপ্রকাশিত) পুস্তিকাটি।

মুন্‌সী সাহেব কুমিল্লার পশ্চিমগাঁওতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন ১৯০৫ সালে। এ সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ৪৫ বছর বয়সে ১৯০৬ সালে তিনি যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাঁর নিজ ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন।

৪৬ বছর বয়সে ১৯০৭ সাল মোতাবেক ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ ও ২৫শে বৈশাখ উত্তর বঙ্গের মঙ্গলঘাটের জলসা এবং ২৭শে বৈশাখ রংপুরের দারাজগঞ্জে জলসা করার পর তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অবস্থার অবনতি হলে সংবাদ পেয়ে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন ২১শে জৈষ্ঠ ছাতিয়ানতলায় আগমন করেন ও মুন্‌সী সাহেবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ২৪শে জৈষ্ঠ কলকাতা থেকে মুসলমান ডাক্তার আনা হয় তাঁর সুচিকিৎসার জন্য কিন্তু সব প্রচেষ্টাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ঐ একই তারিখ বেলা ১টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ– শেখ হবিবর রহমান

২) মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ– মুহাম্মদ আবূ তালিব

৩) মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য- ডঃ আনিসুজ্জামান

৪) মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ- মুস্তফা নুরুল ইসলাম

৫) মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ- আবুল হাসনাত

৬) মুন্সী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ- মুহঃ শাহাদত আলী আনসারী

www.pathagar.com

নাম নাসির হেলাল। পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে মরহুম নাসির উদ্দীন বিশ্বাস এবং মরহুমা নূরজাহান বেগম নূরী। যশোর জেলার চৌগাছা থানার বাড়ীয়ালী গ্রামে ১৯৬২ সালের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এ কলম সৈনিক। শিশুকাল থেকেই ইতিহাস ঐতিহ্যপ্রেমী নাসির হেলাল কলম হাতে বেড়ে ওঠেন। কুষ্টিয়া মুসলিম হাইস্কুল, যশোর মুসলিম একাডেমীসহ গোটা দশেক স্কুল পরিবর্তনের পর ১৯৭৮ সালে নাভারণ বুরুজবাগান হাইস্কুল থেকে তিনি এস.এস.সি পাস করেন। ১৯৮০ সালে যশোর সিটি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি, পরে ১৯৮৪ সালে যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ডিপ্লোমা পাস করেন। দীর্ঘ বিরতির পর বহিরাগত প্রার্থী হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে বি.এ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ (১৯৯২ সালের পরীক্ষা ১৯৯৪ তে অনুষ্ঠিত হয়) পাস করেন। ঝিনাইদহের মহেশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা,বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা'র ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- এর ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগে তিনি তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করছেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নাসির হেলাল- এর উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে- **গবেষণা:** ১. যশোর জেলার ছড়া ২. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার ৩. বারবাজারের ঐতিহ্য ।

উপন্যাস: ১. একাত্তরের প্রেম ২. অবাঞ্ছিত কলঙ্ক ৩. তিন পুরুষ ৪. খুন ৫. প্রেমের অনেক রং।

জীবনী গ্রন্থ: ১. বিশ্বনবীর পরিবার বা আহলে বাইত ২. নবী রাসূলদের জীবন কথা ৩. বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা (দ্বিতীয় প্রকাশ) ৪. মু'মীনদের মা (দ্বিতীয় প্রকাশ) ৫. নবী দুলালী ৬. জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা ৭. সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা।

নাটক: ১. মুন্‌সী মেহেরউল্লা ২. ফেরাউন ৩. সত্য সমাগত।

সম্পাদনা: ১. মুন্‌সী মেহেরউল্লা রচনাবলী (১ম খণ্ড), ২. মুন্‌সী মেহেরউল্লা: জীবন ও কর্ম। রহস্য সিরিজ '[illegible]' যে নাসির হেলাল রচিত তা নিশ্চয় পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই।

'আগুনঝরা ছড়া'র ছড়াকার নাসির হেলাল এবার আমাদের সামনে জাতীয় জাগরণের পথিকৃত, বাগ্মীকুলতীলক, ইসলাম প্রচারক 'মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা' কে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এ গ্রন্থটিও পাঠক নন্দিত হবে।

www.pathagar.com